রমযান শরীফের উপহার

- রোযা, ই'তিকাফ ও তারাভীহ'র মাসাইল
- রোযাবস্থায় ইনজেকশন ও স্যালাইনের বিধান
- তারাভীহ'র পারিশ্রমিক নেয়া কেমন?
- লায়লাতুল ক্বদরের আমল
- সারা বছরের কতিপয় নফল নামায ও নফল রোযার ফযীলত
- নফল নামায জামা'আতে আদায় কেমন?
- আযানের জবাব, মিসওয়াক, শাড়ী ও জামা'আতে নামায আদায়ের ফযীলত
- স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী খাদ্যাভ্যাস
- গরম ও পিপাসা থেকে বাঁচার উপায়
- আম, খেজুর, তরমুজ ইত্যাদি ফল ও সবজি খাওয়ার নিয়মাবলী
- পানাহারের সুন্নাত ও ইসলামী রীতি
- সারা বিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ প্রসঙ্গ
- চুল ঝরে যাওয়ার কারণ ও প্রতিকার
- ফাসিক্ব, ওয়াহাবী, শিয়া এবং মওদূদীপন্থীর পেছনে নামায আদায়
- হিজড়াদের হুকুম

মাওলানা আবূ যাহ্‌রা মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক

"নূর আ-য়া, নূর লা-য়া, নূর পর্ নূরানী রা-ত
ইস্‌লিয়ে রমযান কা সা-রা মাহীনা নূর হ্যায়"

অর্থ- নূর এসেছেন, নূর এনেছেন, নূরের উপর নূরানী রাত।
এ কারণে রমযানের সমগ্র মাসটি নূর-ই নূর।

শ্রেষ্ঠতম রসূলের উপর, শ্রেষ্ঠতম কিতাব
শ্রেষ্ঠতম মাসে, শ্রেষ্ঠতম রাতে অবতীর্ণ হয়।

প্রকাশকাল

১০ রজবুল মুরাজ্জব ১৪৩৯ হিজরী
২৭ এপ্রিল ২০১৮ ঈসায়ী
জুমু'আহ্ বার

সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান
মহাপরিচালক, আন্‌জুমান রিসার্চ সেন্টার

লেখক

মাওলানা আবূ যাহ্‌রা মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক
প্রধান মু'আল্লিম ও সচিব দা'ওয়াতে খায়র
গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ।

প্রকাশনায়

দা'ওয়াতে খায়র কেন্দ্রীয় দপ্তর

হাদিয়া ঃ ৬০/-

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

	বিষয়	পৃষ্ঠা
	রমযানের সংজ্ঞা	০১
	রমযানের চাঁদ দেখা কি জরুরী?	০১
	ক্বোরআনে কারীমের ভাষায় রমযান শরীফ	০১-০২
	হাদীসে পাকের ভাষায় রমযান শরীফ	০৩
	রমযান শরীফের সম্মান	০৪
	রমযান শরীফের অবমাননা	০৪
	রমযান শরীফের অবমাননার ভয়ানক ঘটনা	০৫-০৭
	রমযান শরীফে ইবাদত	০৭-০৮
	রমযান শরীফে ইফত্বার করানোর ফযীলত	০৮-০৯
	রমযান শরীফে দান-সাদাক্বাহ্	০৯-১০
	রমযান শরীফে পরিবারের জন্য ব্যয় করা	১০
	রমযান শরীফে নামাযের ফযীলত	১০-১৩
	কতিপয় নফল নামাযের ফযীলত	১৩
	তাহিয়্যাতুল ওযূ	১৩
	তাহিয়্যাতিল বা দুখুলিল মসজিদ	১৩-১৪
	কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়	১৪
	ইশরাক্বের নামায	১৪
	চাশত বা দ্বোহার নামায	১৫
	যাওয়ালের নামায	১৬
	আওয়াবীন-এর নামায	১৬
	তাওবার নামায	১৬-১৭
	তাসবীহ্-এর নামায	১৭-১৮
	যোহরের দু'রাক'আত নফল নামায	১৯
	আসরের চার রাক'আত সুন্নাত নামায	১৯

	বিষয়	পৃষ্ঠা
	ইশার নামাযের পর দু'রাক্'আত নামায	১৯
	শাফি'উল বিত্র	১৯
	তাহাজ্জুদের নামায	২০
	সলাতুত তাসবীহ্ ও তাজাজ্জুদ নামায জামা'আতে আদায় কেমন?	২১
	রমযান শরীফে উমরাহ্'র ফযীলত	২২
	রমযান শরীফে যিক্রে ইলাহীর ফযীলত	২২
	রমযান শরীফে মৃত্যুবরণের ফযীলত	২৩
	রমযান শরীফে ক্বোরআন তিলাওয়াতের ফযীলত	২৩
	রমযান শরীফে ইলমে দ্বীন অর্জনের ফযীলত	২৪
	রমযান শরীফে মসজিদ আলোকিত করার ফযীলত	২৪
	রমযান শরীফে তারাভীহ্'র ফযীলত	২৪-২৬
	তারাভীহ্'র পারিশ্রমিক নেয়া কেমন?	২৬-২৭
	নিম্নলিখিত তাসবীহও পড়তে পারে	২৭
	চার রাক'আতের পর এভাবে মুনাজাত করতে পারেন	২৮
	শুরুতে রমযান শরীফে ইতিকাফের ফযীলত	২৮
	ই'তিকাফ তিন প্রকার	২৯
	ই'তিকাফের মাসাইল	৩০
	শরীয়তগত প্রয়োজন	৩০
	স্বভাবগত প্রয়োজন	৩১-৩৬
	ই'তিকাফ ভঙ্গ হলে ক্বাযার মাসাইল	৩৬
	রমযান শরীফে লায়লাতুল ক্বদরের আমল	৩৬-৩৮
	শবে ক্বদরের দো'আ	৩৮
	সূরা ক্বদর পাঠের কতিপয় ফযীলত	৩৮
	শবে ক্বদর অর্জনের দো'আ	৩৯

	বিষয়	পৃষ্ঠা
	রমযান শরীফের রোযার ফযীলত	৩৯-৪৩
	রোযার মাসাইল	৪৩
	কাফ্ফারার বিবরণ	৪৪-৪৭
	রোযার মাকরূহসমূহ	৪৭-৪৮
	রোযা অবস্থায় জায়িয কাজসমূহ	৪৮
	যা রোযাকে নষ্ট করে না	৪৮-৫০
	রোযাবস্থায় ইনজেকশন ও স্যালাইনের বিধান	৫০-৫২
	রোযার বিবিধ মাসআলা	৫২-৫৩
	হিজড়াদের হুকুম	৫৩
	রমযান শরীফের রোযা না রাখার ক্ষতি	৫৪
	প্রকৃত অর্থে রোযাদার কে?	৫৪
	চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রোযার উপকারিতা	৫৫-৫৬
	রোযায় অনিরাপদ খাবার বাদ দেওয়ার পরামর্শ	৫৬-৫৭
	স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী খাদ্যাভ্যাস	৫৭
	ভাজাকৃত খাবার থেকে সৃষ্ট কিছু রোগ	৫৭-৬২
	পানাহারের সুন্নাত ও ইসলামী রীতি	৬৩-৬৭
	খানা খাওয়ার পূর্বে পড়ার দো'আ	৬৭
	খানার দা'ওয়াতে খাওয়ার পর পড়ার দো'আ	৬৮
	রমযান শরীফে সাহ্‌রী ও ইফত্বারের ফযীলত	৬৮-৭১
	আযানের পর দো'আ	৭১
	সাহরীর অমূল্য উপহার	৭২
	ইফত্বারের সময় পড়ার দো'আ	৭২
	ইফত্বারের পর পড়ার দো'আ	৭৩
	ইফত্বারের দা'ওয়াতে পড়ার দো'আ	৭৩

	বিষয়	পৃষ্ঠা
	রোযার নিয়্যত	৭৩-৭৪
	শরীয়তসম্মত অর্ধদিবসের সংজ্ঞা	৭৪-৭৬
	ঈদুল ফিতরের চাঁদ রাতের ফযীলত	৭৬-৭৭
	ঈদুল ফিতরের দিনের ফযীলত ও আমল	৭৭-৭৮
	ঈদের দিন যেসব বিষয় সুন্নাত (মুস্তাহাব)	৭৯
	ঈদ কার জন্য?	৮০
	ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহার নামাযের নিয়ম	৮১
	সারা বিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ প্রসঙ্গ	৮১-৮২
	সারা বছরের নফল রোযাসমূহের ফযীলত	৮২
	সফরুল মুজাফ্ফার	৮৩
	রবিউল আউয়াল শরীফ	৮৩
	রবিউস্‌সানী	৮৩
	জমাদিউল আউয়াল	৮৩
	জমাদিউস্ সানী	৮৩
	রজবুল মুরাজ্জাব	৮৩-৮৪
	শা'বানুল মু'আয্‌যাম	৮৪
	শাওয়ালুল মুকার্‌রম	৮৫
	যিল্‌ক্বদুল হারাম	৮৫
	যিল্‌হাজ্জাতুল হারাম	৮৫-৮৬
	সপ্তাহের বিভিন্ন দিনের রোযার ফযীলত	৮৬
	বুধবার ও বৃহস্পতিবার রোযার ফযীলত	৮৬
	বুধ, বৃহস্পতি ও জুমু'আহ বারের রোযা	৮৬
	জুমু'আহ'র দিনের রোযা	৮৭
	শনি ও রবিবারের রোযা	৮৭-৮৮
	নফল রোযা রাখার ফযীলত	৮৮-৮৯
	নফল রোযার মাসাইল	৮৯-৯০

মুখবন্ধ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী 'আলা- হাবীবিহিল কারীম, ওয়া 'আলা- আ-লিহী ওয়া আসহাবিহী আজমা'ঈন। আল্লাহ্ তা'আল্লার নৈকট্য অর্জন ও উভয় জাহানের সাফল্য লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে বিশুদ্ধ ঈমান-আক্বীদায় সমৃদ্ধ হয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম এর প্রদত্ত ইসলামের অনুশাসনগুলো যথাযথভাবে পালন করা। আর এসবের মধ্যে একটি হচ্ছে মাহে রমযানের রোযা। রোযার মাধ্যমে মানুষ কু-প্রবৃত্তিকে দমন করে রুহানী শক্তি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয় আর এভাবে মানুষ রোযার চাহিদাগুলো পূরণ করে অর্থাৎ পেটের সাথে সাথে শরীরের অন্যান্য অঙ্গকে গুনাহ্র ক্ষুধা থেকে বিরত রেখে রোযার মূল উদ্দেশ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়। তাক্বওয়া বা খোদাভীতি অর্জন করে নিজেকে ইবাদতের রঙে রঙ্গিন করে আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু'র সন্তুষ্টির মাধ্যমে উভয় জাহানের সফলতা লাভ করে। ইবাদত করার পূর্বে তা পালনের ইসলাম নির্দেশিত নিয়ম কানূন জানা ফরয। তাই মুসলিম নর-নারীর এ কাজে সামান্য সহযোগিতা স্বরূপ আমাদের এ প্রয়াস। এ পুস্তকে রমযান শরীফের ফযীলত, রোযা ও তারাভীহর জরুরী মাসাইল, ই'তিকাফের প্রয়োজনীয় মাসাইল, ফিতরার মাসাইল এবং চাঁদ রাত ও উভয় ঈদের করণীয় অত্যন্ত জরুরী বিষয়াবলীর সাথে সাথে একজন মানুষ পরিপূর্ণ মুত্তাক্বী হওয়ার জন্য আরো যে সকল ইবাদতের প্রয়োজন, তার মধ্য থেকে কিছু বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যাতে সবাই রমযান শরীফের ফুয়ূযাত ও বারাকাত দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে বছরের বাকী দিন গুলোতেও নিজেকে ইবাদতমূখী রাখতে পারেন। এছাড়া সাহ্রী ও ইফত্বারীতে খাবারের ব্যাপারেও সংযম প্রদর্শনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকে ঠিক রাখা এবং এটা জীবনের প্রতিদিনের রুটিনে শামিল করে সু-স্বাস্থ্য নিয়ে প্রফুল্ল মনে আল্লাহ্ পাকের ইবাদত করার সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করার বিশেষ তাগিদে পানাহারের ইসলামী নীতি ও তার কিছু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষন তুলে ধরা হয়েছে, যাতে সকলেই উপকৃত হতে পারেন। আশা করি আল্লাহ্ ও রসূল সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম, রমযান ও ইবাদত প্রেমিক প্রকৃত ঈমানদারগণ এ পুস্তকের সহয়তার মাধ্যমে নিজের জীবনকে আলোকিত করবেন। তাহলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে। কোন নেক বান্দার আমলের বারাকাতে আমাদের নাজাতের ওসীলা হয়ে যাবে ইন্শা আল্লাহ্। অতি যত্নসহকারে একাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা সত্ত্বেও অনেক জরুরী বিষয় সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে। মুদ্রণ-প্রমাদ থাকা স্বাভাবিক। তাই সম্মানিত জ্ঞানী-গুণী পাঠক মহলের গঠনমূলক ও আন্তরিক পরামর্শ আমাদের পথ চলায় এগিয়ে নিতে সহায়ক ভুমিকা পালন করবে এবং তাঁরাও সাওয়াবের আরো অংশীদার হবেন। পরিশেষে আল্লাহ্ পাকের সুমহান দরবারে সংশ্লিষ্ট সবার বিশেষ করে যাঁদের কিতাবাদি থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে তাঁদের শোকরিয়া আদায় পূর্বক পরিপূর্ণ মাগফিরাত, দীর্ঘায়ু ও সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। আমীন, বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালীন সল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম।

আওলাদে সূফিয়ে আহ্লে সুন্নাত

আবূ যাহ্রা মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রমযানের সংজ্ঞা

رَمَضَان শব্দটি رَمْضَاءُ (রমদ্বাউ) থেকে উদ্ভুত। রমদ্বাউ বলে হেমন্তকালের বৃষ্টিকে। যা দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠ ধূয়ে যায়। আর রবি শষ্য খুব বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সুতরাং এ মাসও হৃদয়ের ময়লা-আবর্জনা ধূয়ে পরিষ্কার করে দেয়। এর ফলে কর্মসমূহের শষ্যক্ষেত্র সবুজ ও সজীব থাকে, এ কারণে এটাকে 'রমদ্বান' মাস বলে।

অথবা এটা رَمْضٌ (রমদ্বুন) থেকে গঠিত। এর অর্থ- 'উষ্ণতা' কিংবা 'জ্বলে যাওয়া'। যেহেতু এ মাসে মুসলমানগণ ক্ষুধা ও পিপাসার তাপ সহ্য করে, কিংবা এটা গুনাহ্গুলো জ্বালিয়ে দেয় সেহেতু সেটাকে 'রমাদ্বান' বলা হয়। হযরত সায়্যিদুনা আনাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলে করীম সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "এ মাসের নাম 'রমাদ্বান' রাখা হয়েছে, কেননা, এটা গুনাহ্গুলোকে জ্বালিয়ে দেয়।

(কানযুল উম্মাল, খন্ড-৮)

রমযানের চাঁদ দেখা কি জরুরী?

চাঁদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাতের চাঁদকে 'হিলাল' (নতুন চাঁদ) বলা হয়। এর পরের রাতগুলোর চাঁদকে 'ক্বমর' বলা হয়। পূর্ণিমার চাঁদকে বদর বলা হয়। নতুন চাঁদ দেখার দো'আ তিন রাত পর্যন্ত পাঠ করতে পারেন। (মিরক্বাতুল মাফাতিহ্, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৮৩)

পাঁচটি মাসের চাঁদ দেখা ওয়াজিবে কিফায়া। তা হলোঃ শা'বান, রমাদ্বান, শাওয়াল, যিলক্বদ ও যিলহজ্জ (ফাতাওয়ায়ে রযভিয়্যাহ, কানূনে শরীয়ত)।

(অর্থাৎ - কিছু মুসলমানের এই মাসগুলোর চাঁদ দেখা আবশ্যক! অন্যথায় সকলে গুনাহগার হবে। যদি কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে। যেমন - আকাশ কুয়াশাচ্ছন্ন ও মেঘলা থাকা ইত্যাদি)। নতুন চাঁদ দেখে ওইদিকে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা মাকরূহ যদিওবা অন্যদেরকে দেখানোর জন্য করে থাকে। (আলমগীরি, শিরাজিয়া, বযাযিয়া)·(আঙ্গুলদ্বারা ইশারা না করে, ঐ গাছের পাশ দিয়ে, একটু উপরে ইত্যাদি বলা যেতে পারে) (যখীরায়ে দো'আ-এ খায়র, পৃষ্ঠা-৩২)

ক্বোরআনে কারীমের ভাষায় রমযান শরীফ

আল্লাহ্পাক ইরশাদ করেন–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ

কানযুল ঈমান শরীফের অনুবাদ ঃ রমযানের মাস, যাতে ক্বোরআন অবতীর্ণ

হয়েছে- মানুষের হিদায়ত ও পথ-নির্দেশ এবং ফয়সালার সুস্পষ্ট বার্তাসমূহ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেনো অবশ্যই সেটার রোযা রাখে। (সূরা বাক্বারা, আয়াত- ১৮৫, ১০৫)

কোরআন কারীমে শুধু 'রমযান' শরীফের নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেটার ফযীলতসমূহ বর্ণিত হয়েছে। অন্য কোন মাসের না সুস্পষ্টভাবে নাম আছে, না ফযীলত।

আরো ইরশাদ হচ্ছে- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

কানযুল ঈমান শরীফের অনুবাদ ঃ নিশ্চয় আমি সেটা ক্বদর রাতে অবতীর্ণ করেছি। (সূরা ক্বদর, আয়াত-১)

সম্মানিত মুফাস্সিরগণ রহিমাহুমুল্লাহ্ এই 'সূরা ক্বদ্‌র' এর প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন, "এ রাতে (রমযান মাসে) আল্লাহ্ তা'আলা ক্বোরআন করীম লওহে মাহ্ফূয থেকে প্রথম আসমানে নাযিল করেছেন। তারপর প্রায় তেইশ বছরের মেয়াদকালে আপন প্রিয় হাবীব সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম-এর উপর ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ করেছেন। (তাফসীরে সাভী, খণ্ড-৬)

হযরত সায়্যিদুনা উবাইদ ইবনে কা'ব রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ ২৭শে রমযানুল মুবারকের রাতকেই শবে ক্বদর বলেন। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুমাও এ কথাই বলেছেন। শাহানশাহে বাগদাদ হুযূর গাউসে পাক রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ও উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন। হযরত সায়্যিদুনা শাহ্ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ বলেন, শবে ক্বদর রমযান শরীফে ২৭তম রাতে হয়ে থাকে। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আ'যম আবূ হানীফা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ থেকে এ প্রসঙ্গে দু'টি অভিমত বর্ণিত হয়েছেঃ

(১) শবে ক্বদ্‌র বা সম্মানিত রাত রমযানুল মুবারকেই রয়েছে কিন্তু কোন রাতটি তা নির্দ্ধারিত নয়।

(২) তার এক প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে- শবে ক্বদ্‌র পুরো বছরই ঘুরতে থাকে; কখনো মাহে রমযানুল মুবারকে হয়, কখনো অন্যান্য মাসে।

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফি'ঈ রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু'র মতে, শবে ক্বদ্‌র রমযানুল মুবারকের শেষ দশ দিনেই রয়েছে। আর এর দিনটি নির্ধারিতই রয়েছে, যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত পরিবর্তিত হবেনা। (ওমদাতুল ক্বারী, খণ্ড-৮)

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু ও হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু'র মতে, শবে ক্বদ্‌র রমযানুল মুবারকের শেষ দশদিনের বিজোড় রাতগুলোর মধ্যে হয়। কিন্তু এর জন্য কোন একটি রাত নির্দ্ধারিত নেই। প্রতি বছর এ বিজোড় রাতগুলো (২১, ২৩, ২৫, ২৭, ২৯)-এর মধ্যে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। (তাফসীরে সাভী, খণ্ড-৬)

যদিও বুযুর্গানে দ্বীন এবং মুফাস্সিরগণ ও মুহাদ্দিসগণ রহিমাহুমুল্লাহ-এর শবে ক্বদ্‌র নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে, তবুও প্রায় সবার অভিমত হচ্ছে- প্রতি বছর শবে ক্বদ্‌র ২৭শে রমযানুল মুবারকের রাতেই হয়ে থাকে। (তাফসীরে সাভী, খণ্ড-৬, তাফসীরে আযীযী, খণ্ড-৪)

বুযুর্গানে দ্বীন রহিমাহুমুল্লাহ এর- শবে ক্বদর নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে, তবুও প্রায় সবার অভিমত হচ্ছে শবে ক্বদর ২৭শে রমযানুল মুবারকের রাতেই হয়ে থাকে।

হাদীসে পাকের ভাষায় রমযান শরীফ

হযরত সায়্যিদুনা আবূ হোরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ থেকে বর্ণিত, পাঁচ ওয়াক্বতের নামায, জুমু'আহ্ পরবর্তী জুমু'আহ্ পর্যন্ত, রমযান মাস পরবর্তী রমযান মাস পর্যন্ত গুনাহ্সমূহের কাফ্ফারা, যতক্ষণ কবীরা গুনাহ্ থেকে বিরত থাকা হয়। (সহীহ্ মুসলিম, খণ্ড-১)

হযরত সায়্যিদুনা 'আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, রহমতে 'আলম সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, "নিশ্চয় জান্নাতকে বছরের শুরু থেকে আগামী বছর পর্যন্ত রমযানুল মুবারকের জন্য সাজানো হয়।" আরো ইরশাদ করেন, "রমযান শরীফের প্রথম দিন জান্নাতের গাছগুলোর নিচে থেকে আয়ত-লোচনা হুরদের উপর বাতাস প্রবাহিত হয়, আর তারা আরয করে, "হে আল্লাহ্! আপনার বান্দাদের মধ্যে এমন সব বান্দাদেরকে আমাদের স্বামী করুন, যাদেরকে দেখে আমাদের চক্ষুগুলো জুড়ায়। আর তারাও যখন আমাদেরকে দেখে তখন তাদেরও চক্ষু জুড়ায়।" (মিশকাত শরীফ)

হযরত সায়্যিদুনা 'আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, রসূলে আকরাম সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যখন রমযান শরীফের প্রথম তারিখ আসে, তখন মহান 'আরশের নিচে থেকে মুবাশ্শিরাহ্' নামীয়া বাতাস প্রবাহিত হয়, যা জান্নাতের গাছ-পালাকে নাড়া দেয়। ওই বাতাস প্রবাহিত হবার কারণে এমনি মনোরম উচ্চস্বর ধ্বনিত হয়, যার চেয়ে উত্তম সুর আজ পর্যন্ত কেউ শোনেনি। ওই সুর শোনে আয়ত-লোচনা হুরেরা বেরিয়ে আসে। অতঃপর তারা জান্নাতের উঁচু উঁচু মহলগুলোর উপর দাঁড়িয়ে যায়। আর বলে, "কেউ আছো, যে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে আমাদের প্রার্থী হবে, যাতে তার সাথে আমাদের বিয়ে হয়?" তারপর ওই হুরগুলো জান্নাতের দারোগা (হযরত সায়্যিদুনা) রিদ্বওয়ান ('আলায়হিস্সালাম)-কে বলে, "আজ এ কেমন রাত?" (হযরত সায়্যিদুনা)

রিদ্বওয়ান ('আলায়হিস্‌সালাম) তদুত্তরে বলেন, "হাঁ। এটা মাহে রমযানের প্রথম রাত। জান্নাতের দরজাগুলো হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মতের রোযাদারদের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে।" (আত্‌তারগীব ওয়াত্ তারহীব, খণ্ড-২)

রমযান শরীফের সম্মান

বোখারা শহরে এক অগ্নিপূজারী বাস করতো। একবার রমযান শরীফে সে তার পুত্রকে সাথে নিয়ে মুসলমানদের বাজার অতিক্রম করছিলো। তার পুত্র প্রকাশ্যভাবে কোন কিছু খাচ্ছিলো। অগ্নিপূজারী যখন এটা দেখলো, তখন তার পুত্রকে একটা থাপ্পর মারলো এবং এ বলে শাঁসালো যে, রমযান মাসে মুসলমানদের সম্মুখে (বাজারে) আহার করতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না? ছেলেটি তার জবাবে বললো, আব্বাজান! আপনিও তো রমযান মাসে আহার করেন! তার বাবা তাকে বললো, আমি আমার ঘরে গোপনে আহার করি। (রোযাদার) মুসলমানদের সম্মুখে খাইনা। আর এ কল্যাণময় মাসের অবমাননা করি না। কিছুকাল পর ওই অগ্নিপূজারীর মৃত্যু হলো। কেউ তাকে স্বপ্নে দেখলো যে, সে জান্নাতে ঘুরাফেরা করছে। তাকে জান্নাতে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি তো অগ্নিপূজারী ছিলেন! জান্নাতী কিভাবে হয়ে গেলেন?

তখন সে বলতে লাগলো, সত্যিই আমি অগ্নিপূজারী ছিলাম। কিন্তু যখন আমার মৃত্যুর সময় এলো, তখন আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু রমযান শরীফের প্রতি আমার সম্মান প্রদর্শনের বরকতে আমাকে ঈমানের মহামূল্যবান সম্পদ এবং মৃত্যুর পর জান্নাত দান করে ধন্য করেছেন। (নুযহাতুল মাজালিস, খণ্ড-১)

রমযান শরীফের অবমাননা

রমযান শরীফের পবিত্র মুহূর্তগুলোকে তাসের গুটিগুলো, ক্রিকেট, ফুটবল, ব্যাটমিন্টন, লুডু, ভিডিও গেমস ইত্যাদি খেলে, গান-বাজনা শ্রবণ, ফেইসবুকে নোংরা দৃশ্য ও ফিল্ম দর্শন করে এবং অনর্থক কার্যাদির মধ্যে সময় বিনষ্ট করা থেকে বাঁচুন। এসব কিছু আল্লাহ্ পাকের স্মরণ থেকে উদাসীনকারী। কিছু লোক আছে যারা রোযাতো রেখে নেয়, কিন্তু তাদের সময় পার করার জন্য এসব কিছুতে লেগে যায়। অথচ এতে একদিকে রমযান শরীফের অবমাননা হয়, অপরদিকে এ মুবারক মাসের বরকতরাজি হাত ছাড়া হয়ে যায়। আর দুনিয়া-আখিরাতের অসংখ্য আযাব নির্দ্ধারিত হয়ে যায়। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হ্ তো বেশী ঘুমাতেও নিষেধ করেছেন। কারণ, তাতে রোযার কষ্ট অনুভূত হয়না এবং এভাবে অনর্থক সময় অতিবাহিত

হয়ে যাবে। তিনি বলেন, রোযাদারের জন্য সুন্নাত হচ্ছে, দিনের বেলায় বেশীক্ষণ শয়ন না করা; বরং জাগ্রত থাকা, যাতে ক্ষুধা ও দুর্বলতার প্রভাব অনুভূত হয়।

(কীমিয়ায়ে সা'আদাত)

রসূলে করীম সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ اَزْحَمُهَا

অর্থাৎ- সর্বোৎকৃষ্ট ইবাদত হচ্ছে তাই, যাতে কষ্ট বেশী হয়। (কাশ্‌ফুল খিফা)

সুতরাং যারা খেলা-তামাশা ও হারাম কার্যাদিতে সময় বরবাদ করে তারা কতোই বঞ্চিত ও হতভাগা!

রমযান শরীফের অবমাননার ভয়ানক ঘটনা

পড়ুন আর তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন।

একদিন হযরত সায়্যিদুনা মাওলা 'আলী মুশকিল কোশা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কূফার এক কবরস্থানে গমণ করলেন। সেখানে একটা নতুন কবরের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়লো। তাঁর মনে সে কবরের অবস্থা জানার কৌতুহল জন্মালো। তাই তিনি আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা'র দরবারে আরয করলেন, হে আল্লাহ্! এ মৃতের অবস্থা আমার সামনে উন্মোচন করুন! আল্লাহ্ তা'আলার 'আলীশান দরবারে তাঁর ফরিয়াদ ক্ববূল হলো। তখনই তাঁর ও ওই মৃত ব্যক্তির মধ্যবর্তী সকল পর্দা অপসারিত হলো। তখন তাঁর সম্মুখে এক ভয়ানক দৃশ্য বিরাজমান ছিলো। তিনি দেখতে পেলেন মৃত লোকটি আগুনে পরিবেষ্টিত। আর ক্রন্দনরত অবস্থায় তাঁর নিকট আরয করছিলো,

يَا عَلِيُّ اَنَا غَرِيْقٌ فِى النَّارِ وَحَرِيْقٌ فِى النَّارِ .

অর্থাৎ- ওহে (মাওলা) 'আলী! আমি আগুনে ডুবে গেলাম, আমি আগুনে জ্বলছি। সে কবরের ভয়ঙ্কর দৃশ্য ও মৃত ব্যক্তির আর্তনাদ ও কষ্টদায়ক আবেদনে মাওলা মুশকিল কোশা 'আলিয়্যুল মুরতাদ্বা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্'র কোমল হৃদয়ে নাড়া দিলো। তিনি মহামহিম রবের মহান বারগাহে হাত উঠালেন আর অত্যন্ত নম্রতার সাথে ওই ব্যক্তির ক্ষমার জন্য আবেদন পেশ করলেন। তখন অদৃশ্য থেকে আওয়াজ এলো,"হে 'আলী! আপনি তার জন্য সুপারিশ করবেন না! কেননা, রোযা রাখা সত্ত্বেও লোকটি রমযান শরীফের অবমাননা করতো। পবিত্র রমযানেও গুনাহ্ থেকে বিরত থাকতো না। দিনের বেলায় রোযা তো রাখতো, কিন্তু রাতগুলোতে গুনাহে লিপ্ত থাকতো" শেরে খোদা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ একথা শুনে খুবই ব্যথিত হলেন এবং সাজদাবনত হয়ে ক্রন্দনরত অবস্থায় আরয করতে লাগলেন, "হে আল্লাহ্! আমার ইয্যত-সম্মান তোমার কুদরতের পবিত্র হস্তে। এ লোকটি বড় আশা নিয়ে আমার নিকট সাহায্যের আবেদন করেছে।

ওহে আমার দয়ালু মালিক! তুমি তার নিকট আমাকে অপমানিত করো না। তার অসহায় অবস্থার প্রতি দয়া প্রদর্শন করো, তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও" মাওলা 'আলীর সাজদাবনত হয়ে কান্নারত ফরিয়াদ আল্লাহ্'র রহমতের সাগরে ঢেউ তুললো। অদৃশ্য আহ্বান শুনা গেলো, "ওহে 'আলী! আমি তোমার ব্যতিত হৃদয়ের দো'আর কারণে তাকে ক্ষমা করে দিলাম"। তৎক্ষণাৎ ওই ব্যক্তির কবর থেকে শাস্তি তুলে নেয়া হলো! (আনীসুল ওয়া'ইযীন)

রমযান শরীফে জনসম্মুখে ধুমপানকারী, পানাহারকারী, দিনের বেলায় হোটেল-রেস্তোঁরা খোলা রেখে বে-রোযাদারকে পানাহারে সাহায্যকারী, রোযা রাখা সত্ত্বেও হারামের প্রতি দৃষ্টিপাতকারী, গীবত বা পরনিন্দাকারী, গান-বাদ্য শ্রবণকারী, গালিগালাজকারী, খেল-তামাশায় লিপ্ত হয়ে শোর-চিৎকারের মাধ্যমে অন্যের ঘুম ও ইবাদতে বিঘ্নতা সৃষ্টিকারী, সময় পার করার বাহানায় মূল্যবান মুহূর্তগুলোকে অনর্থক কাজে ব্যয়কারী, ঈদ শপিং এর নামে বেপর্দা হয়ে মার্কেটগুলোতে বিচরণকারী নারী-পুরুষ ও নানা অপকর্মে লিপ্ত হওয়া ব্যক্তিদের এ ভীতিপ্রদ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এ লোকটি রোযা রাখা সত্ত্বেও অন্যান্য পাপাচারে লিপ্ত হয়ে রমযান শরীফের অবমাননা করার কারণে পরাক্রমশালী আল্লাহ্'র ক্রোধের শিকার হয়ে কবরের শাস্তিতে আক্রান্ত হয়েছে। এ পবিত্র মাসে যারা হারাম কাজে লিপ্ত হবে তাদেরকে সতর্ক করে আল্লাহ্র হাবীব সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এ মাসে ব্যভিচার করেছে কিংবা মদ পান করেছে, আগামী রমযান পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা ও যতো আসমানী ফিরিশতা রয়েছেন সকলে তার উপর অভিসম্পাত করতে থাকেন। আর ওই ব্যক্তি যদি আগামী রমযান মাস পাবার পূর্বে মৃত্যুবরণ করে, তবে তার নিকট এমন কোন নেকী থাকবেনা, যা তাকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। সুতরাং তোমরা রমযান মাসের ব্যাপারে ভয় করো। কেননা, যেভাবে এ মাসে অন্যান্য মাসের তুলনায় সাওয়াব বৃদ্ধি করে দেয়া হয়, তেমনি গুনাহ্গুলোর বিষয়ও (অর্থাৎ গুনাহ্ও বৃদ্ধি করে লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়)। (ত্বাবারানী, মু'জামে সগীর, খণ্ড-১)

সাধারণতঃ রমযান শরীফে ওইসব লোক গুনাহ বেশী করে, যারা অন্যান্য মাসেও বেশী পরিমাণে গুনাহে লিপ্ত থাকে। কেননা, তাদের প্রবৃত্তি তাদেরকে গুনাহ্ সমূহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। সুতরাং এ পবিত্র মাসে বেশী পরিমাণে ইস্তিগফার অর্থাৎ বারবার তাওবা করার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করা উচিত।

হযরত সায়্যিদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ থেকে বর্ণিত, রহমাতুল্লিল 'আলামিন সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, রমযান শরীফের প্রতিটি রাতে আসমানে সোবহে সাদিক্ব পর্যন্ত একজন আহ্বানকারী এ বলে আহ্বান করেন, "হে কল্যাণকামী! আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের দিকে অগ্রসর হও এবং (তা) পরিপূর্ণ করো। ওহে মন্দকর্মপরায়ণ! মন্দকাজ থেকে বিরত থাকো এবং শিক্ষা গ্রহণ করো। কেউ ক্ষমা চাওয়ার আছো কি? তার আবেদন ক্ববূল করা হবে। কেউ তাওবাকারী আছো কি? তার তাওবা ক্ববূল করা হবে। কেউ প্রার্থনাকারী আছো কি? তার দো'আ ক্ববূল করা হবে। কেউ কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করার জন্যও আছো কি? তার প্রার্থনা পূরণ করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা রমযানুল মুবারকের প্রতিটি রাতে ইফত্বারের সময় ষাট হাজার গুনাহ্গারকে দোযখ থেকে মুক্তি দান করেন। আর ঈদের দিন সমগ্র মাসের সমসংখ্যক গুনাহ্গারকে ক্ষমা করা হয়। (আদ্দুরুরুল মানসূর, খণ্ড-১)

এছাড়া, অন্যান্য বর্ণনায় প্রতিদিন দশ লক্ষ, প্রতি জুমুআহ'র রাতে ও দিনে প্রতিটি মুহূর্তে এমন দশ লক্ষ গুনাহগারকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হয়, যারা শাস্তির উপযোগী বলে সাব্যস্ত হয়ে যায়। (কানযুল উম্মাল, খণ্ড-৮ থেকে সংকলিত)

রমযান শরীফে ইবাদত

রসূলে খোদা সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কবর থেকে উঠার সময় তিন শ্রেণীর মানুষের সাথে ফিরিশতাগণ মুসাফাহাহ্ (করমর্দন) করবেন; ১) শহীদ ২) রমযানে ইবাদতকারী এবং ৩) আরাফার রোযা পালনকারী। (কিয়া আ-প জা-নতে হ্যায়) হাদীস শরীফে আরাফার দিন হাজীকে আরাফাতে রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। (সহীহ ইব্নে খুযাইমাহ, খণ্ড-২)

হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ বলেন, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম শা'বান মাসের শেষ দিনে আমাদের সম্মুখে খোতবা প্রদানকালে ইরশাদ করেছেন,"হে মানবজাতি! তোমাদের উপর একটি মহান ও বরকতময় মাস ছায়া বিস্তার করেছে, যে মাসটি এমন যে , তাতে একটি রাত (এমনি) রয়েছে, যা (এক) হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। এ মাসের রোযা আল্লাহ্ ফরয করেছেন। আর সেটার রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত-বন্দেগী করা (তারাভীর নামায আদায় করা) সুন্নাত।

যে ব্যক্তি এতে একটি নফল আদায় করে নৈকট্য অর্জনে তৎপর হবে সে অন্যান্য মাসে ফরয আদায়কারীর ন্যায় প্রতিদান পাবে। আর যে ব্যক্তি এ মাসে ফরয আদায় করবে, সে অন্য মাসের সত্তর (টি) ফরয আদায়কারীর সমান সাওয়াব পাবে। এটা ধৈর্যেরমাস। আর ধৈর্যের সাওয়াব হলো জান্নাত। আর এ মাস হচ্ছে পরস্পর সহমর্মিতার মাস। এটা মু'মিনদের জীবিকা বৃদ্ধি পাবার মাস।
(বায়হাক্বী শরীফ, শু'আবুল ঈমান-এর বরাতে মিশকাত শরীফ)

এটা হচ্ছে ওই মাস, যার প্রথমাংশ 'রহমত', সেটার মধ্যভাগ 'মাগফিরাত' এবং শেষাংশ 'জাহান্নাম থেকে মুক্তি' (নাজাত)। যে ব্যক্তি তার দাস (কর্মচারী)-এর উপর এ মাসে কাজকর্ম সহজ করে দেয় আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন। জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন। এ মাসে চারটি কাজ বেশী পরিমাণে করো। সেগুলোর দু'টি হলো এমনি যে, সে দু'টি দ্বারা তোমরা আপন রবকে সন্তুষ্ট করতে পারবে। আর অবশিষ্ট দু'টির প্রতি তো তোমরা মুখাপেক্ষীই। সুতরাং যে দু'টি কাজ দ্বারা তোমরা আপন প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করতে পারবে, তা হলো– ১) লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ্ (অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই) মর্মে সাক্ষ্য দেয়া এবং ২) ইস্তিগফার করা। (ক্ষমা প্রার্থনা করা)। আর যে দু'টি থেকে তোমরা বাঁচতে পারোনা (তোমরা মুখাপেক্ষী) সেগুলো হলো– ১) আল্লাহ্ তা'আলার মহান দরবারে জান্নাত প্রত্যাশা করা এবং ২) দোযখ থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করা। (সহীহ ইবনে খুযায়মাহ্, খণ্ড-২ থেকে সংকলিত)

রমযান মাসে আমাদের উচিৎ হবে খুব বেশী পরিমাণে আল্লাহ্ পাকের ইবাদত করা এবং এমন প্রতিটি কাজও করা। যাতে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি রয়েছে। হযরত সায়্যিদাতুনা মা 'আয়িশা সিদ্দীক্বাহ্ রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আন্হা বলেন, যখন রমযান মাস আসতো, তখনই রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম মহামহিম আল্লাহ্'র ইবাদতের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ও তৎপর হয়ে যেতেন আর গোটা মাসেই নিজের পবিত্র বিছানায় আরাম করতেন না। (দুররে মানসূর, খণ্ড-১)

তিনি আরো বলেন, যখন রমযান মাসের শুভাগমন হতো তখন আল্লাহ্'র রসূলের রং মুবারক পরিবর্তিত হয়ে যেতো। আর হুযূর বেশী মাত্রায় নামায পড়তেন, খুবই কান্নাকাটি করে দো'আ-প্রার্থনা করতেন এবং আল্লাহ্'র ভয় হুযূরকে ছাইয়ে ফেলতো। (শু'আবুল ঈমান, খণ্ড-৩)

রমযান শরীফে ইফত্বার করানোর ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু হতে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীস শরীফে এটাও রয়েছে, যে ব্যক্তি এতে রোযাদারকে ইফত্বার করায়, তা তার গুনাহ সমূহের জন্য মাগফিরাতই। তার গর্দান (তথা তাকে) আগুন থেকে মুক্ত করে দেয়া হবে। আর এ যে ইফত্বার করায় সে তেমনি সাওয়াব পাবে যেমন পাবে রোযাদার ব্যক্তি, (তবে) তার সাওয়াবে কোনরূপ হ্রাস করা ছাড়াই। আমরা আরয করলাম, হে আল্লাহ্'র রাসূল! আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে এমন বস্তু পায় না, যা দিয়ে ইফত্বার করাবে, হুযূর পুরনূর সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এ নেকী ওই ব্যক্তিকে দান করবেন, যে এক ঢোক দুধ, কিংবা একটা খেজুর অথবা এক ঢোক পানি দ্বারা রোযাদারকে ইফত্বার করায়। আর যে ব্যক্তি রোযাদারকে পেট

ভরে আহার করায়, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা আমার 'হাওয' থেকে পান করাবেন। ফলে সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না। শেষ পর্যন্ত জান্নাতে (সে) প্রবেশ করবে। (সহীহ ইবনে খুযায়মাহ্, খণ্ড-২ থেকে সংক্ষেপিত)

হযরত সায়্যিদুনা আবূ সা'ঈদ খুদরী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আক্বায়ে নামদার সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সাহ্রীর সবই অপরিসীম বরকতে পরিপূর্ণ। সুতরাং তা ত্যাগ করোনা, যদিওবা এক চুমুক পানি পান করেও তা সম্পন্ন করা হয়। কেননা, সাহ্রী আহারকারীর উপর আল্লাহ্ পাক এবং তাঁর ফিরিশতারা রহমত বর্ষণ করে থাকে। (মুসনাদে ইমাম আহমাদ) হযরত সায়্যিদুনা সালমান ইবনে 'আমির রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ থেকে বর্ণিত, মদীনার তাজ্দার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ রোযার ইফত্বার করে, তবে সে যেনো খেজুর কিংবা খোরমা দিয়ে ইফত্বার করে। কারণ, তা হচ্ছে বারাকাতই। আর তা না পেলে পানি দ্বারা করবে, তাতো পবিত্রকারী। (তিরমিযী, খণ্ড-২)

হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাবীবে রহমান সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি হালাল আহার্য দ্বারা অথবা পানি দ্বারা একজন রোযাদারকে আহার করাবে, আল্লাহ্র ফিরিশতারা মাহে রমযান শরীফে তার জন্য মাগফিরাত কামনা করবে। আর হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাইল 'আলায়হিস্ সালাম পবিত্র শবে ক্বদরে তার জন্য (আল্লাহ্র দরবারে) গুনাহ্ মাফ চাইবেন। এক বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি রোযাদারকে পানি পান করাবে আল্লাহ্ পাক তাকে আমার হাউযে কাউসার থেকে পানি পান করাবেন। ফলে ওই ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করা পর্যন্ত পিপাসার্ত হবেনা। (ত্বাবারানী ফিল কবীর)

রমযান শরীফে দান-সাদাক্বাহ্

এ পবিত্র মাসে বেশী পরিমাণে সাদাক্বাহ্ করাও সুন্নাত। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা 'আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুমা বলেন, যখন রমযান মাস আসে তখন আল্লাহ্র রসূল প্রত্যেক কয়েদীকে মুক্তি দিতেন এবং প্রত্যেক ভিখারীকে দান করতেন। (আদ্দুরুল মানসূর, খণ্ড-১)

হযরত সায়্যিদুনা আনাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ থেকে বর্ণিত, রসূলে মুহতাশাম সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম এর পবিত্রতম দরবারে আরয করা হলো, রমযানের পর কোন রোযা উত্তম? ইরশাদ করলেন, রমযানের সম্মানের জন্য শা'বার। তারপর আরয করা হলো, কোন সাদাক্বাহ্ উত্তম? ইরশাদ করলেন, রমযান মাসে সাদাক্বাহ্ করা। (তিরমিযী শরীফ)

মুসলমানদের উচিত হচ্ছে রমযান শরীফে বেশি পরিমাণে দান করা। কারণ, এটা সুন্নাতে রসূল সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম। (মিরআত, খন্ড-৩) স্মর্তব্য যে, মহান রব রমযান মাসে খুব দান করেন ও বদান্যতা প্রদর্শন করেন। এ সুন্নাত-এ ইলাহী অনুসারে হুযূরে আনওয়ার সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লামও রমযান মাসে বেশি দান করতেন। সুতরাং তিনি হলে মহান রবের বদান্যতার পূর্ণাঙ্গতম প্রকাশস্থল।

রমযান শরীফে পরিবারের জন্য ব্যয় করা

হযরত সায়্যিদুনা দ্বামরাহ্ রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ থেকে বর্ণিত, রসূলে মুহতাশাম সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, রমযান মাসে পরিবারের লোকজনের ব্যয়কে প্রশস্ত করো। কেননা, মাহে রমযানে খরচ করা আল্লাহ্ তা'আলার পথে খরচ করার মতোই। (কানযুল উম্মাল, খণ্ড-৮)

হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারূক্ব রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ বলেন, ওই মাসকে স্বাগতম, যা আমাদেরকে পবিত্রকারী! গোটা রমযান মাস কল্যাণই কল্যাণ। দিনের বেলায় রোযা হোক, কিংবা রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত। এ মাসে ব্যয় করা জিহাদে অর্থ ব্যয় করার মর্যাদা রাখে। (তাম্বীহুল গাফিলীন)

এছাড়া রমযানে পানাহারের হিসাব হয় না। এতে জীবিকা প্রশস্তও হয়। ফলে গরীবরাও নি'মাতরাজি খেয়ে নেয়। (তাফসীরে নাঈমী, খণ্ড-২)

রমযান শরীফে নামাযের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ থেকে বর্ণিত, শাহে বাহ্‌র ওবার সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন রমযান মাসের প্রথম রাত আসে তখন আসমানগুলো ও জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। আর সেগুলো সর্বশেষ রাত পর্যন্ত বন্ধ হয় না। যে কোন বান্দা এ কল্যাণময় মাসের যে কোন রাতে নামায পড়ে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতিটি সাজদার পরিবর্তে তার জন্য পনেরশ' নেকী লিপিবদ্ধ করেন। আর তার জন্য জান্নাতে লাল পদ্মরাগের মহল তৈরী করেন, যার ষাট হাজার দরজা থাকবে। প্রতিটি দরজার কপাট স্বর্ণের তৈরী হবে, যাতে লাল বর্ণের পদ্মরাগ খচিত থাকবে। সুতরাং যে কেউ রমযানের প্রথম রোযা রাখে তার জন্য আল্লাহ্‌র সত্তর হাজার ফিরিশতা মাগফিরাতের দো'আ করতে থাকেন। রাত ও দিনে যখনই সে সাজদা করে তার ওই প্রতিটি সাজদার পরিবর্তে (বিনিময় স্বরূপ) তাকে (জান্নাতে) একেকটা গাছ দান করা হবে, সেটার ছায়া অতিক্রম করতে অশ্বারোহীকে পাঁচশ' বছর দৌড়াতে হবে। (শু'আবুল ঈমান, খণ্ড-২)

সুতরাং রোযাদারদের উচিত এ মাসে বেশী পরিমাণে নফল নামায আদায় করা। তারাভীহ'র নামাযের সাথে, সাথে, সূর্যোদয়ের বিশ মিনিট পর ইশরাক্বের ২ বা ৪

রাক্'আত নামায, এর কিছুক্ষণ পর সূর্য স্থির হবার আগ পর্যন্ত ৪ রাক্'আত চাশ্‌তের নামায, (নামাযের স্থায়ী সময়সূচী অনুযায়ী যোহরের সময় আরম্ভ হবার পূর্বে ৩৫-৪০ মিনিট পর্যন্ত সূর্য স্থির থাকে, এসময় নামায পড়া মাকরূহে তাহ্‌রীমী) যোহরের দু' রাক্'আত নফল নামায, আসরের ৪ রাক্'আত সুন্নাত নামায, মাগরিবের ২ রাক্'আত নফলসহ ৬ রাক্'আত আওয়াবীনের নামায, ইশার ফরযের পূর্বে ৪ রাক্'আত সুন্নাত নামায, পরের ২ রাক্'আত নফল নামায, বিত্‌রের পর ২ রাক্'আত শফি'উল বিত্‌র নামায, রমযানে জুমু'আহ্‌গুলোতে ফরযের পূর্বে ২ রাক্'আত তাহিয়্যাতুল ওযূ, ২ রাক্'আত দুখুলিল মসজিদ, পরে ২ রাক্'আত নফল, যখন ওযূ করবেন নিষিদ্ধ সময় না হলে ২ রাক্'আত তাহিয়্যাতুল ওযূ, যদি সে সময় মসজিদে প্রবেশ করার সৌভাগ্য অর্জন হয়, তবে ২ রাক্'আত দুখুলিল মসজিদ এবং সাহরীর সময় তাহাজ্জুদের নামায আদায়ে সচেষ্ট হবেন। প্রতিদিন একবার সালাতুত্‌তাসবীহ্'র নামায দিনে বা রাতে, অন্যথায় সপ্তাহে একবার আদায় করার চেষ্টা করবেন। অন্তত শবে ক্বদরের রাতে একবার তো পড়েই নেবেন। ইশার নামাযের পর একটু ঘুম বা তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেই তাহাজ্জুদের সময় শুরু হয়ে যায়। (বাহারে শরীয়ত, রদ্দুল মুহতার-এর বরাতে) রমযান শরীফে সাহ্‌রীর সময় ঘুম থেকে উঠে খাওয়ার আগে বা পরে কমপক্ষে ২ রাক্'আত উর্ধ্বে ১২ রাক্'আত আদায় করুন। (৮ রাক্'আত পর্যন্ত সুন্নাত, ১২ রাক্'আত নফল বুযুর্গদের নিয়ম, এর বেশীও পড়া যায়)।

সুতরাং এ পবিত্র মাসে যেমন তাহাজ্জুদ আদায়ের সুযোগ থাকে তেমনি তাহাজ্জুদে অভ্যস্থ হবার সৌভাগ্যও অর্জন করা সম্ভব, যদি একটু সজাগ হওয়া যায় এবং অলসতা ত্যাগ করা যায়। এ মাসে পুরুষ রোযাদার পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আত সহকারে আদায় করবেন। রোযাদার মহিলাগণ যথাসময়ে ঘরে নামায আদায় করে নেবেন। বিশেষতঃ ইফত্বার খেজুর বা পানি দিয়ে করবেন। রোযাদার ভাইয়েরা সামান্য কিছু খেয়ে মসজিদে মাগরিবের নামায আদায় করবেন, অলসতা না করে ফজরে নামায জামা'আত সহকারে আদায় করবেন। কোন বাধ্যবাধকতা ব্যতীত (অলসতাবশতঃ) মাগরিবের নামাযে আসমানে তারকা দেখা যাওয়ার সময় পর্যন্ত দেরী করাও মাকরূহে তাহরীমী। (বাহারে শরীয়ত)

হাদীসে পাকে রয়েছে- মিসওয়াক করে দু'রাক'আত নামায আদায় করা মিসওয়াক ছাড়া সত্তর রাক'আতের চেয়ে উত্তম। মাশায়িখ কিরাম বলেন, যে ব্যক্তি মিসওয়াকে অভ্যস্থ হয়, মৃত্যুর সময় তার কালিমা পড়া নসীব হয়। এবং যে আফিম (নেশার বস্তু) খায়, মৃত্যুর সময় তার কালিমা নসীব হবে না। (বাহারে শরীয়ত, খন্ড-১)।

রসূলে মক্ববূল সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আত সহকারে আদায় করে, আল্লাহ্

তা'আলা তাকে সত্তরটি হজ্জের সাওয়াব দান করবেন। (তায়কিরাতুল ওয়া'ইযীন)
আরো ইরশাদ করেন, জামা'আত সহকারে নামায একাকী পড়া অপেক্ষা সাতাশ গুণ বেশী উত্তম। (বোখারী ও মুসলিম শরীফ)

তাহলে কোন মুসলমান ভাই যদি কমপক্ষে ৩০ বছর জামা'আত সহকারে নামায আদায় করে, তাহলে তিনি ৮১০ বছর হায়াত পেলে যতগুলো নামায আদায় করতে পারতেন, জামা'আতে নামায পড়ায় তা ৩০ বছরে পেয়ে যাবেন। কত মহান সৌভাগ্য। আর লজ্জা ত্যাগ করে পাগড়ী সহকারে নামায আদায় করার সৌভাগ্য অর্জন করবেন। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, পাগড়ী সহকারে দু'রাক'আত নামায আদায় করা পাগড়ী বিহীন সত্তর রাক'আত নামায পড়া থেকে উত্তম । (গাউসিয়া তারবিয়াতী নেসাব) । হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি তা'আলা ' আলায়হ্ বলেন, পাগড়ী সহকারে এক জুমু'আহ্ আদায় করা, পাগড়ী বিহীন সত্তর জুমু'আহ্ আদায়ের সমপরিমান। (জামি'সগীর)। আমাদের প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম বেশীরভাগ সময় শির (মাথা) মুবারকে টুপির উপর পাগড়ী মুবারক সাজিয়ে রাখতেন। ফাতাওয়ায়ে রযাভিয়্যাহ্-তে ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত রহমাতুল্লাহি তা'আলা 'আলায়হ্ বলেন, পাগড়ী পরা প্রত্যেক যুগের নবী গণের সুন্নাত (রীতি)। (গাউসিয়া তারবিয়াতী নেসাব) পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে সাত হাত এবং জুমু'আহ্'র নামাযে বার হাত কাপড়ের(সাদা, কালো, সবুজ ও অন্যান্য রঙের, যা শরীয়ত নিষিদ্ধ নয়) পাড়গী পরিধান উত্তম (মিরআতুল মানাজীহ্)।

যে ব্যক্তি রমযান মাসে নিয়মিতভাবে জামা'আত সহকারে নামায আদায় করে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে প্রতি রাক'আতের বিনিময়ে আপন নি'মাতে পরিপূর্ণ একটি শহর দান করবেন। (কেয়া আ-প জানতে হাঁয়)

হযরত সায়্যিদুনা আবূ উমামা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্র রাসূল সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি এ-ই জামা'আত সহকারে নামায বর্জনকারীরা জানতো যে, জামা'আত বর্জনে কী ক্ষতি রয়েছে, তাহলে (তারা) হামাগুড়ি দিয়ে উপস্থিত হয়ে যেতো। (ত্বাবারানী)। প্রত্যেক বিবেকবান প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমান পুরুষ, যে জামা'আত সহকারে নামায পড়ার ক্ষমতা রাখে, তার উপর জামা'আত ওয়াজিব। বিনা কারণে একবারও জামা'আত ত্যাগকারী গুনাহ্গার ও শাস্তির ভাগী হবে, কয়েকবার বর্জনকারী ফাসিক্ব এবং সাক্ষীর অনুপোযোগী হবে আর তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। যদি প্রতিবেশী নিশ্চুপ থাকে (তাকে জামা'আতের জন্য আহ্বান না করে) তাহলে তারাও গুনাহ্গার হবে। (দূররুল মুখতার)

মুসলমান রমণীদের জামা'আত ক্বায়িম করা ওয়াজিব নয়। (পুরুষদের)

জামা'আতে শরীক হবারও অনুমতি নেই। (কারণ বর্তমানে তাতে ফিৎনার সম্ভাবনা থাকে। (বাহারে শরীয়ত থেকে সংকলিত)

হযরত সায়্যিদুনা 'আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ থেকে বর্ণিত, তাজ্দারে রিসালাত সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মহিলার ক্ষেত্রে দালানে (অর্থাৎ বড় কামরায়) নামায পড়া, ঘরের আঙ্গিনায় নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম। আর ছোট কামরায় দালান (অর্থাৎ বড় কামরায় নামায পড়া) থেকে উত্তম। (আবূ দাউদ শরীফ)

কতিপয় নফল নামাযের ফযীলত

যে ওমরী ক্বাযা (নামায), নফল (ইশরাক্ব ও চাশ্ত) এর সময় আদায় করেন, তিনি এ জন্য নফল (নামাযের) সাওয়াব পাওয়ার আশাও রয়েছে। (ক্বান্নী বেহেশতী যেওর)

নামাযের নিয়্যত

নিয়্যত আরবী শব্দ, যার শাব্দিক অর্থ অন্তরের সংকল্প। শরীয়তের পরিভাষায় দৃঢ় ইচ্ছাকে নিয়্যত বলে। সুতরাং কেউ যদি মনে মনে নিয়্যত করে মুখে শুধু আল্লাহ আকবার বলে তবে নিয়্যত হয়ে যাবে। জিহ্বায় বা মুখে নিয়্যত উচ্চারণ করা মুস্তাহাব এবং মৌখিক উচ্চারণে আরবী হওয়া আবশ্যকীয় নয়, বাংলা বা অন্য যেকোন ভাষায় হলেও চলবে; অবশ্য আরবী ভাষায় উত্তম। অতএব কোন ওয়াক্বতের কি নামায তা দৃঢ়ভাবে অন্তরে থাকলে জিহ্বার উচ্চারণে ভিন্ন হলেও কোন অসুবিধা নেই। সুতরাং নিয়্যত নিয়ে এত ঝামেলা বা পেরেশানীর অবকাশ নেই। শরীয়ত তথা ফিক্বহশাস্ত্র একেবারে সহজ করে দিয়েছে। (কিতাবুল আশবাহ ওয়ান্নাযায়ের কৃত ইমাম ইবনে নুজাইন আল হানাফী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্)

তাহিয়্যাতুল ওযূ

ওযূর পর অঙ্গসমূহ শুকে যাবার পূর্বে দু'রাক'আত নামায পড়া মুস্তাহাব। (দুররে মুখতার, খণ্ড-২)
হযরত সায়্যিদুনা ওক্ববা বিন আমির রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, শাহানশাহে আব্রার সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ওযূ করে এবং ভাল করে ওযূ করে। অতঃপর যাহির ও বাতিনে সহকারে একাগ্রতা করে দু'রাক্'আত নামায পড়ে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (সহীহ মুসলিম)

গোসলের পরও দু'রাক্'আত নামায পড়া মুস্তাহাব। ওযূর পর ফরয বা সুন্নাত পড়লে, তাহিয়্যাতুল ওযূর পরিপূরক হয়ে যাবে। (রদ্দুল মুহতার, খণ্ড-২) তবে মাকরূহ সময় হলে কোন নামায আদায় করবেন না।

তাহিয়্যাতিল বা দুখুলিল মসজিদ

মসজিদে প্রবেশ করলে, তখন মসজিদের হক আদায় করার জন্য কমপক্ষে দু'রাক্'আত নামায পড়া সুন্নাত; বরং চার রাক্'আত পড়া উত্তম। হযরত

সায়্যিদুনা আবূ ক্বাতাদাহ্ রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ থেকে বর্ণিত, ফখরে বনী আদম সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে, সে যেন বসার আগে দু'রাক্'আত নামায পড়ে নেয়। (সহীহ বোখারী, মুসলিম)

কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়

*এমন সময় মসজিদে আসলো, যখন নফল নামায পড়া মাকরূহ, যেমন ফজর উদিত (ফজরের সময় শুরু) হবার পর (থেকে সূর্য উদয়ের ২০ মিনিট পর পর্যন্ত) কিংবা আসরের নামাযের পর, (যোহরের ওয়াক্ত আরম্ভ হবার পূর্বে ৩৫-৪০ মিনিট পর্যন্ত, সূর্য স্থির থাকার সময় পর্যন্ত), তখন সে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়বে না বরং তাসবীহ, তাহলীল, যিক্র-আযকার ও দুরূদ শরীফ পাঠে মশগুল হবে। এতে মসজিদের হক্ব আদায় হয়ে যাবে। (রদ্দুল মুহতার)

* ফরয বা সুন্নাত কিংবা অন্য কোন নামায (যেমন- তাহিয়্যাতুল ওযূ ইত্যাদি) মসজিদে পড়ে নিল। তাহলে তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় হয়ে গেলো যদিও সেটার নিয়্যত করা না হয়। এ নামাযের হুকম ওই ব্যক্তির জন্য, যে মসজিদে কোন নামায আদায়ের নিয়্যতে যায়নি; বরং শিক্ষা, যিক্র ইত্যাদির জন্য গিয়ে থাকে। (প্রাগুক্ত)

* প্রতিদিন (মসজিদে যতবারই প্রবেশ করুক) একবার তাহিয়্যাতুল মসজিদ (আদায় করলে) যথেষ্ট। প্রতিবার (পড়ার) প্রয়োজন নেই। (প্রাগুক্ত)

* যদি কোন মুসলমান ভাই বিনা ওযূতে মসজিদ গেলো; কিংবা অন্য কোন কারণে (যেমন মাকরূহ সময় ইত্যাদি) তা আদায় করতে পারেনি, তাহলে ৪ বার এটা পড়ে নিবেনঃ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ ।

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লা-হি ওয়াল হামদুলিল্লা-হি ওয়ালা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার।

ইশরাক্বের নামায

সূর্যোদয়ের কমপক্ষে বিশ মিনিট পর থেকে দ্বিপ্রহর (সূর্য স্থির হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ নামাযের সময় থাকে।

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ থেকে বর্ণিত, হুযূর রহমতে 'আলম সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ফজরের নামায জামা'আত সহকারে পড়ে সূর্য উপরে উঠা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার যিক্র করতে থাকে। অতঃপর দু'রাক্'আত নামায পড়ে, তাহলে সে পূর্ণ (একটি) হজ্জ ও (একটি) উমরার সাওয়াব পাবে। (সুনানে তিরমিযী, খণ্ড-২)

এছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা তার ওইদিনের সমস্ত কাজ নিজ রহমতে সমাধান করে দেয়ার জন্য যিম্মাদার হয়ে যান এবং তার জন্য বেহেশতে ৭০টি প্রাসাদ তৈরী করেন। (শরহে বিক্বায়া)

* যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করার পর জায়নামাযে (অর্থাৎ নামাযের স্থানে) বসে থাকে, অবশেষে ইশরাক্বের নফল নামায আদায় করে নেয়, এমতাবস্থায় শুধু ভাল কথাই (কিতাব অধ্যায়ন, বয়ান, ইত্যাদি) বলে, তবে তার গুনাহ্ সমুদ্রের ফেনার চেয়ে অধিক হলেও (তা) ক্ষমা করে দেয়া হবে। (আবূ দাউদ শরীফ, খণ্ড-২) হযরত শায়খ শিহাব উদ্দীন সোহরাওয়ার্দী রহমাতুল্লাহি তা'আলা 'আলায়হ্ বলেন, এ নামাযের ফলে হৃদয়ে নূর পয়দা হয়। যে ব্যক্তি হৃদয়ে নূর (জ্যোতি) চায়, সে যেনো নিয়মিতভাবে ইশরাক্বের নামায পড়ে। (আশি'আহ্)।

চাশত বা দ্বোহার নামায

ইশরাক্বের নামাযের পর হতেই চাশতের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়ে দ্বিপ্রহরের আগ পর্যন্ত থাকে। (গাউসিয়া তারবিয়াতী নেসাব)

হযরত সায়্যিদুনা আবূ যার্ গিফারী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ থেকে বর্ণিত, মাদানী মদীনাওয়ালা সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মানুষের উপর তার প্রতি জোড়ার বদলে সাদাক্বাহ্ রয়েছে। (মোট তিনশ' ষাট জোড়া) প্রত্যেক তাসবীহ (অর্থাৎ সুবাহানাল্লা-হ্ বলা) সাদাক্বাহ্। প্রত্যেক হাম্দ (অর্থাৎ আলহামদুলিল্লা-হ্ বলা) সাদাক্বাহ্। লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ্ বলা সাদাক্বাহ্, ভাল কাজের নির্দেশ দেয়া সাদক্বাহ্ এবং (মন্দ থেকে) বারণ করাও সাদাক্বাহ্। এগুলোর স্থলে দু'রাক্'আত চাশতের নামায পড়লে যথেষ্ট হয়ে যায়। (মুসলিম শরীফ)

অর্থাৎ- দু'রাক্'আত চাশতের নামায আদায় করে নিলে (দেহের) সমস্ত জোড়ার সাদাক্বাহ্ আদায় হয়ে যায়।

আরো ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দ্বোহার নামায আদায় করে, সে ব্যক্তি একটি ক্বূবূল হজ্জ ও একটি উমরার সাওয়াব পায়। হুযূর সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম একটু চুপ থেকে আবার বলেন, পূর্ণ, পূর্ণ এক হজ্জ ও এক উমরার সাওয়াব পাবে। (মিশকাত শরীফ)

অন্যত্র ইরশাদ করেন, চাশতের নামায রিযক্ব প্রশস্ত করে, অভাব দুরীভূত করে। (নুযহাতুল মাজালিস)

* দ্বোহার নামায আদায় কারীর সমস্ত অভাব-অভিযোগ আল্লাহ্ তা'আলা দূর করে দেন। (হিসনে হাসীন, আল ক্বাওলুল জামীল)

* হযরত সায়্যিদুনা আবূ যার্ গিফারী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ থেকে বর্ণিত, মক্কী-মাদানী আক্বা সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দু'রাক্'আত চাশতের নামায পড়ে, সে অলসতাকারীদের অন্তর্ভূক্ত বলে লিখা হবেনা, যে চার রাক্'আত নামায পড়ে সে ইবাদতকারীদের অন্তর্ভূক্ত বলে লিপিবদ্ধ হবে, যে ছয় রাক্'আত পড়ে, ওইদিন তার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে, যে আট রাক্'আত পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে

অনুগতদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেন এবং যে বার রাক্'আত পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি মহল তৈরী করবেন এবং এমন কোন দিন রাত নেই, যার মধ্যে আল্লাহ্ জাল্লাশানুহ্ বান্দাদের উপর ইহসান ও দান করবেন না। বস্তুতঃ ওই বান্দা অপেক্ষা বেশী কারো প্রতি ইহসান করেননি, যাকে তিনি স্বীয় যিক্রের ইলহাম (বা প্রেরণা দান) করেছেন। (ত্বাবারানী)

* হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি বার রাক্'আত চাশতের নামায পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে স্বর্ণের মহল তৈরী করবেন। (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্ শরীফ) মিরক্বাত প্রণেতা বলেছেন, চাশতের নামায হুযূর সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম এর জন্য ওয়াজিব ছিলো, তবে প্রতিদিন নয়, কখনো কখনো। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাতা (মিরআত, খন্ড-২)। সঠিক অভিমত হচ্ছে চাশতের সুন্নাত এবং সবসময় পড়া মুস্তাহাব। (মিরক্বাত) এ নামায ঘরে সম্পন্ন করা মুস্তাহাব। (মিরআত, খন্ড-২)

যাওয়ালের নামায

সূর্য স্থির হয়ে পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার পর থেকে যোহরের পূর্ব সময়ের মধ্যে চার রাক্'আত নামায পড়া যায়। হাদীস শরীফে রয়েছে- এসময়ে আসমানের দরজা খুলে যায় এবং আমার নিকট পছন্দনীয় যে, আমার আমল আসমানে উঠানো হোক। (ইহইয়াউল উলূমুদ্দীন) এছাড়া এ নামায আদায়াকারীর সাথে সত্তর হাজার ফিরিশতা নামায পড়েন আর রাত পর্যন্ত তার জন্য মাগফিরাত কামনা করবেন।

আওয়াবীন-এর নামায

আওয়াবীনের নামাযের সময়সীমা মাগরিবের নামাযের ফরয ও সুন্নাতের পর হতে আরম্ভ হয়ে ইশার নামাযের সময় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে।

(গাউসিয়া তারবিয়াতী নেসাব)

হযরত সায়্যিদুনা আবূ হোরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাক্'আত নামায পড়ে এবং ওইগুলোর মাঝখানে কোন মন্দ কথা বলে না , তাহলে ওই ছয় রাক্'আত বার বছরের ইবাদতের সমান গণ্য করা হবে। (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্ শরীফ)

হযরত সায়্যিদুনা আম্মার বিন ইয়াসির রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ বলেন, সরকারে নামদার সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম -এর 'আলীশান ফরমান, যে কেউ মাগরিবের পর ছয় রাক্'আত (নামায) পড়ে, তার সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে, যদিও সেটা সমুদ্রের ফেনার সমান হয়। (ত্বাবারানী)

তাওবার নামায

হযরত সায়্যিদুনা আবূ বকর সিদ্দীক্ব রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ থেকে বর্ণিত, মাহ্বূবে রব্বুল ইয্যাত সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন কোন বান্দা গুনাহ্ করে, অতঃপর ওযূ করে নামায আদায়

করে এরপর ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ্ কারীম তার গুনাহ্ ক্ষমা করে দেবেন। এরপর এ আয়াত শরীফ পাঠ করলেন-

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ـ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا اللهُ ـ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ .

কানযুল ঈমান শরীফের অনুবাদ ঃ এবং ওইসব লোক, যখন তারা কোন অশ্লীলতা কিংবা স্বীয় আত্মার প্রতি যুলম করে, তখন তারা আল্লাহ্কে স্মরণ করে স্বীয় গুনাহ্র ক্ষমা প্রার্থনা করে, এবং আল্লাহ্ ব্যতীত গুনাহ কে ক্ষমা করবে? আর তারা জেনে বুঝে নিজেদের কৃত অপরাধের প্রতি পুনঃ পুনঃ অগ্রসর হয়না।

(সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৫, সুনানে তিরমিযী, খণ্ড-১) উত্তম হচ্ছে সেটার প্রথম রাক্'আতে 'সূরা কাফিরূন' আর দ্বিতীয় রাক্'আতে 'সূরা ইখলাস' পড়বে। উত্তম হচ্ছে এ নামাযে গোসল করবে এবং ধৌতকৃত কাপড় পরবে। (মিরআতুল মানাজীহ্, খন্ড-২)

তাসবীহ্-এর নামায

একদা আল্লাহ্র রসূল সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম আপন চাচাজান হযরত সায়্যিদুনা 'আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্-কে ডেকে বললেন, চাচাজান! আমি কি আপনাকে দান করবনা? সুসংবাদ দেবনা? দশটি মর্তবা লাভের অধিকারী করব না? তা হচ্ছে আপনি যদি চার রাক্'আত সলাতুত্ তাসবীহ (তাসবীহ'র নামায) পড়েন তাহলে (আল্লাহ) আপনার বিগত গুনাহ ও আগাম গুনাহ্, জানা গুনাহ্ ও অজানা গুনাহ্, ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত, প্রকাশ্য গুনাহ ও অপ্রকাশ্য গুনাহ্ মাফ করে দেবেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম বলেন– যদি আপনার সামর্থ্য থাকে, তাহলে প্রত্যেহ একবার এ নামায পড়ুন। যদি তা না পারেন, তাহলে প্রত্যেক জুমু'আহ্র দিনে পড়ুন। যদি তাও না পারেন, তবে মাসে একবার করে পড়ুন। যদি তাও না পারেন, তাহলে বৎসরে একবার পড়ুন। যদি তাও না পারেন, তাহলে জীবনে একবার হলেও এ নামায পড়া চাই। (মুসলিম শরীফ) মাকরূহ ওয়াক্ত ছাড়া যে কোন সময় এ নামায পড়া যায়। তবে যোহরের আগে পড়াটা উত্তম। (আলমগীরি) **প্রতিদিন হচ্ছে-** মাকরূহ ওয়াক্ত ব্যতীত অন্য যেকোন সময়ে সম্পন্ন করো। উত্তম হচ্ছে যোহরের পূর্বে পড়া। **সপ্তাহে হলে-** উত্তম হচ্ছে জুম'আহ্র দিন সূর্য পশ্চিম দিকে হেলার পর; জুম'আহ্র নামাযের পূর্বে পড়া। কেননা, ঐদিনে একটি নেকির সাওয়াব সত্তর গুণ পাওয়া যায়। হযরত সায়্যিদুনা 'আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্- এর অভিমত। তিনি এভাবেও আমলটি করতেন। (মিরআত, খন্ড-২) **বছরের হলে-** রমযান মাসে বিশেষ করে জুমু'আহ্র অথবা ২৭ রমযান শরীফে পড়লে অতি উত্তম। (প্রাগুক্ত)

নোটঃ জুমু'আহ কিংবা যোহরের নামাযের সময় নামাযের স্থায়ী সময়সূচী অনুযায়ী শুরু হওয়ার পূর্বে চল্লিশ মিনিট পর্যন্ত নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী। সুতরাং যোহর বা জুমু'আহ্‌র ওয়াক্বত আরম্ভ হওয়ার পর থেকে খতীব মিম্বরে বসার পূর্ব পর্যন্ত পড়তে পারবেন।

নিয়ম ঃ অন্যান্য নামাযের নিয়মে চার রাক্'আত সলাতুত্তাসবীহ্'র নিয়্যত করে সানা পড়ার পর নিম্নের কালিমাটি ১৫ বার পড়বে,

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ .

উচ্চারণ ঃ সুবাহা-নাল্লা-হি ওয়াল হাম্‌দুলিল্লা-হি ওয়া লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার।

অর্থঃ আল্লাহ্ পবিত্রতম এবং সব প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই এবং আল্লাহ্ অতিশয় মহান। এরপর আ'ঊযুবিল্লা-হ্ ও বিসমিল্লা-হ পড়ে সূরা ফাতিহা পাঠ করে এর সাথে একটি সূরা পাঠ করে রুকূ'তে যাওয়ার পূর্বে ১০ বার পাঠ করবেন। তারপর রুকূ'তে গিয়ে প্রথমে রুকূ'র তাসবীহ কমপক্ষে ৩বার পাঠ করে এ কালিমাটি ১০ বার পাঠ করবেন। রুকূ' থেকে উঠে, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রব্বানা লাকাল হাম্‌দ অথবা আল্লা-হুম্মা রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ বলে ১০ বার পাঠ করবেন। এরপর সাজদায় গিয়ে কমপক্ষে ৩ বার সাজদার তাসবীহ পাঠ করে এ কালিমাটি ১০ বার পড়ুন। প্রথম সাজদা থেকে উঠে সোজা হয়ে বসে ১০ বার এ কালিমাটি পড়ুন। এরপর দ্বিতীয় সাজদায় গিয়ে ৩ বার সাজদার তাসবীহ পড়ে এ কালিমাটি ১০ বার পড়ুন। এ নিয়মে চার রাক্'আত নামায আদায় করবেন।

তবে স্মরণ রাখবেন যে, কালিমাটি দন্ডায়মান অবস্থায় শুধু সূরা ফাতিহার পূর্বে ১৫ বার বাকী সকল স্থানে ১০ বার করে পাঠ করবেন। এভাবে প্রতি রাক্'আতে ৭৫ বার হিসেবে চার রাক্'আত নামাযে সর্বমোট ৩০০ বার কালিমাটি পাঠ করবেন। প্রথম ও শেষ বৈঠকে যথা নিয়মে তাশাহ্হুদ ইত্যাদি পড়বেন।

(বোখারী শরীফ, বাহারে শরীয়ত, খণ্ড-৪)

* তাসবীহ আঙ্গুলে গণনা করবেন না বরং সম্ভব হলে মনে মনে গণনা করবেন। অন্যথায় আঙ্গুল দিয়ে চেপে চেপে গণনা করবেন। (দুররুল মুখতার)

* যদি কোন জায়গায় ভুলে ১০ বারের কম পড়া হয়, তাহলে অন্য জায়গায় যেন পড়ে নেয়া হয়। যাতে সংখ্যা পূর্ণ হয়। উত্তম হচ্ছে ভুলের পরবর্তী জায়গায় পূরণ করে নেয়া। যেমন, রুকূ' থেকে দাঁড়ানো অবস্থায় ভুল হলে সাজদায় আদায় করবেন; কিন্তু যদি রুকূ'তে ভুল হয়, তাহলে সেটা রুকু'র পর দাঁড়ানো অবস্থায় আদায় না করে সাজদায় আদায় করবেন; কেননা, দাঁড়ানোর সময় কম হয়ে থাকে আর প্রথম সাজদায় ভুল করলে মাঝখানে বসার সময় আদায় না করে দ্বিতীয় সাজদায় আদায় করবেন। (রদ্দুল মুহতার)

* যদি সাজদ সাহ্‌ভ (সাহু) ওয়াজিব হয় এবং সাজদাহ্ করেন, তাহলে এ সাজদাহ্ দু'টিতে ওই কালিমা (তাসবীহ) পড়া হবে না। (নামায কে আহকাম)

যোহরের দু'রাক'আত নফল নামায

যোহরের ফরয নামায আদায়ের আগেও চার রাক্'আত নামায আদায় করা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্। আর ফরযের পর দু'রাক্'আত সুন্নাত ও দু'রাক্'আত নফল পড়ার বিধান রয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে: যে ব্যক্তি যোহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাক্'আত এবং পরের এ চার রাক্'আত (নামাযের) প্রতি যত্নবান হবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর (জাহান্নামের) আগুন হারাম করে দেবেন। (সুনানে নাসাঈ)

আল্লামা সায়্যিদ তাহত্বাবী রহমাতুল্লাহি তা'আলা 'আলায়হ্ বলেন, (ওই ব্যক্তি) শুরু থেকেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না এবং তার গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে আর তার উপর (বান্দার হক নষ্ট করার) যা পাওনা রয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতিপক্ষকে সন্তুষ্ট করে দিবেন। অথবা এর মর্মার্থ হলোঃ তাকে এমন কাজের সামর্থ্য দান করবেন, যার কারণে তার কোন শাস্তি হবে না।

(হাশিয়ায়ে তাহত্বাবী, খণ্ড-১)

আল্লামা শামী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হ্ বলেন, তার জন্য সুসংবাদ হলো, সৌভাগ্যের সাথে (ঈমান সহকারে তার মৃত্যু) হবে এবং সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। (ফাতাওয়ায়ে শামী, খণ্ড-২)

আসরের চার রাক'আত সুন্নাত নামায

যে ব্যক্তি আসরের নামাযের পূর্বে চার রাক্'আত নামায আদায় করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার শরীরকে (জাহান্নামের) আগুনের জন্য হারাম করে দিবেন। (মু'জামুল কবীর, কৃত ত্বারারানী, খণ্ড-২৩)

ইশার নামাযের পর দু'রাক্'আত নামায

হযরত সায়্যিদুনা 'আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ইশার নামাযের পর দু'রাক্'আত নামায আদায় করবে এবং প্রতি রাক্'আতে সূরা ফাতিহার পর ১৫ বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে এমন দু'টি মহল তৈরী করবেন, যা জান্নাতবাসীরা দেখবেন। (তাফসীরে দুররে মানসূর, খণ্ড-৮)

শাফি'উল বিত্‌র

বিত্‌রের নামাযের পর দু'রাক'আত নফল নামায পড়া উত্তম। এর প্রথম রাক্'আতে সূরা যিলযাল এবং দ্বিতীয় রাক্'আতে সূরা কাফিরূন পড়া ভালো। হাদীস শরীফে আছে- যদি রাতে কেউ তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হতে না পারে তবে এ দু'রাক'আত নামায তাহাজ্জুদের স্থলাভিষিক্ত হবে।

(বাহারে শরীয়ত ও আমলে শরীয়ত)

তাহাজ্জুদের নামায

রাতের নামাযের মধ্যে এক প্রকারের নাম হলো তাহাজ্জুদ। আর তা হলো ইশার নামাযের পর রাতে ঘুমিয়ে (বা একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়ার পর) উঠে নফল নামায আদায় করা। ঘুমানোর পূর্বে যা আদায় করা হয় তা তাহাজ্জুদ নয়। (কিয়ামুল লায়ল বা রাত্রিকালীন নফল নামায।) তাহাজ্জুদ কমপক্ষে দু'রাক্'আত সর্বাধিক বার রাক'আত আর হুযূর পুরনূর সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম থেকে আট রাক্'আত পর্যন্ত প্রমাণ মিলে। (বাহারে শরীয়ত, খণ্ড-৪) তবে রাতের শেষ তৃতীয়াংশে পড়া উত্তম। (ফতহুল ক্বদীর)

আর সুবহে সাদিক্বের সময় (এর সময়) শেষ হয়। তাহাজ্জুদ নামাযের পর কিছুক্ষণ শুয়ে থাকাও সুন্নাত। (মিরআত)

তাহাজ্জুদের নামায ইসলামের প্রাথমিক যুগে সকলের উপর ফরয ছিলো। পরে উম্মতের উপর ফরয হওয়ার বিধান রহিত হয়ে যায়। আর হুযূর সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম -এর উপর শেষ পর্যন্ত সেটা (ফরয হিসেবে) বহাল থাকে। (আশি'আতুল লুম'আত)

সঠিক অভিমত হচ্ছে, আমাদের জন্য তাহাজ্জুদ সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্-এ কিফায়া; যদি এলাকার কেউ না পড়ে, তবে সকলেই সুন্নাত পরিত্যাগকারী হিসেবে গণ্য হবে। যদি একজন পড়ে নেয়, তবে সকলে দায়মুক্ত হবে। (অর্থাৎ- এলাকার কেউ সম্পন্ন করলে সবাই গুনাহ থেকে অব্যহতি পাবে। (মিরআতুল মানাজীহ্, খণ্ড-২)

এক হাদীসে ইঙ্গিতে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ পড়ে না, সে পরিপূর্ণ (কামিল) নেককার নয়। (মিরআতুল মানাজীহ্ , খন্ড-২)

হযরত আবূ সা'ঈদ ও হযরত আবূ হোরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেন, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন কোন ব্যক্তি রাতে স্বীয় পরিবারকে জাগিয়ে দেয়, অতঃপর তারা উভয়ে অথবা সে একাকী দু'রাক্'আত নামায পড়ে, তারা উভয়ে যিক্‌রকারী বা যিক্‌রকারীনীদের মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। (আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ্)

অর্থাৎ তাহাজ্জুদের দু'রাক'আত নামায পড়ার বারাকাতে সারা রাত ইবাদত করার সাওয়াব পাওয়া যায়। আর ওই সময় কিছুক্ষণ যিক্‌র করার বারাকাতে মানুষ সর্বদা যিক্‌রকারীদের দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। (মিরআতুল মানাজীহ্, খণ্ড-২)

নিয়ম ঃ তাহাজ্জুদে ক্বিরাআত আদায়ের ব্যাপারে স্বাধীনতা রয়েছে, যা ইচ্ছা পড়তে পারবে। তবে উত্তম হলো, ক্বোরআন মজীদের যতটুকু মুখস্থ রয়েছে, তা পাঠ করে কিংবা এভাবেও আদায় করতে পারে যে, প্রতি রাক্'আতে সূরা ফাতিহার পর তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করবে। তাহলে প্রতি রাক্'আতে ক্বোরআন মজীদ (১বার) খতম করার সাওয়াব অর্জিত হবে।

(ফাতাওয়ায়ে রযভিয়্যাহ্, খণ্ড-৭ থেকে সংকলিত)

সলাতুত তাসবীহ্ ও তাজাজ্জুদ নামায জামা'আতে আদায় কেমন

ইমামে আহলে সুন্নাত সায়্যিদী আ'লা হযরত রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু বলেন; তারাভীহ্ ব্যতীত নফল নামাযে ইমাম সাহিব ব্যতীত তিন ব্যক্তি (মুসল্লী) পর্যন্ত তো জায়িযই। চার ব্যক্তি হলে হানাফী কিতাবাদীতে মাকরূহ বলা হয়েছে অর্থাৎ মাকরূহে তানযীহী। যার অর্থ খিলাফে আউলা, না গুনাহ ও হারাম। তবে এ মাসআলায় মত বিরোধ রয়েছে আর অনেক বুযুর্গানেদ্বীন হতে জামা'আতে নফল নামায ঘোষণা সহকারে আদায়ের প্রমাণ রয়েছে। এবং সর্বসাধারণকে উত্তম কাজ থেকে নিষেধ করা উচিত নয়। ওলামায়ে উম্মত ও হুকামায়ে মিল্লাতগণ এধরণের নিষেধাজ্ঞা করা থেকে বারণ করেছেন। (ফাতাওয়ায়ে রযভিয়্যাহ্, পুরাতন সংস্করণ, খন্ড-৩) যদিও ওলামায়ে কিরাম এসব নামায জামা'আতে পড়ার ব্যাপারে মাকরূহ বলেছেন কিন্তু সর্বসাধারণকে এ ফাত্ওয়া দেয়া ঠিক হবে না। কেননা নেকির প্রতি তাদের আগ্রহ যেন কমে না যায়। ওলামায়ে কিরামের এ মাসআলায় মত বিরোধ রয়েছে। আর পরবর্তী যুগের ওলামায়ে কিরামের অনেকে এটা জায়িয হওয়ার পক্ষেও লিখেছেন। সাধারণ মুসলমানকে নামাযের প্রতি অনুরাগী রাখা তাদেরকে এর প্রতি বিরাগভাজন করা থেকে অনেক উত্তম। ফাতাওয়ায়ে রযভিয়্যাহ্, নতুন সংস্করণ, খন্ড-৭) ওলামায়ে কিরাম অলসতা ও ক্লান্তি এবং কষ্টকে সামনে রেখে ক্বোরআনে পাকের খতম শরীফ করার সময় কমপক্ষে তিনদিন নির্দ্ধারণ করেছেন। কিন্তু উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের জন্য এক রাতে খতম শরীফ আদায় করা নিষেধ নয় (শর্ত হল তাজভীদ সহকারে আদায় করতে হবে) (নফল কী জামা'আত করনা ক্যায়সা?)

সালাতুত তাসবীহ ও তাহাজ্জুদ উভয়টা হল নফল নামায। ক্বোরআন শরীফ ও হাদীস শরীফ তথা শরীয়তে মুহাম্মদীসল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম এর মধ্যে অনেক গুরুত্ব ও ফযীলত বিদ্যমান। তাই আল্লাহ্ ও তাঁর হাবীবের নৈকট্য অর্জনে তা সদা পড়া উচিত। সাধারণ নফল নামায সর্বদা ফরযের মত গুরুত্ব সহকারে আযান-ইক্বামতের সাথে মুসল্লীগণকে জমায়েত করে ঘোষণা করার মাধ্যমে জামা'আতসহ আদায় করা ফুক্বাহ-ই কেরাম মাকরূহ বলেছেন। তবে ঘোষণা করা ছাড়া সমবেত উপস্থিত কয়েকজন মুসল্লি মিলে কখনো কখনো উক্ত নামায সমূহ জামা'আতসহ আদায় করলে অসুবিধা নাই। অনেক বুযুর্গানেদ্বীন ও প্রখ্যাত আউলিয়া-ই কিরাম বরকতপূর্ণ রজনীসমূহে(রাগাইব (রজবের ১ তারিখ), বরাত, ক্বদর ও দুই ঈদের রাতে) নফল নামায জামা'আত সহকারে আদায় করেছেনে মর্মে অনেক বর্ণণা নির্ভরযোগ্য কিতাব সমূহে পাওয়া যায়। এগুলো যেহেতু নফল ইবাদত, তাই এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা অনুচিত। গুনিয়াতুত তালেবীন কৃত গাউসুল আ'যম দস্তগীর রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু, তাফসীরে রূহুল বয়ান, সূরা ক্বদরের ব্যাখ্যায় এবং দেওয়ানে আযীযে

গাযীয়ে দ্বীন ও মিল্লাত আল্লামা সায়্যিদ মুহাম্মদ আযীযুল হক শেরে বাংলা আলক্বাদেরী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু সহ অনেকেই বৈধ হওয়ার পক্ষে প্রমাণাদি পেশ করেছেন। সুতরাং এসব বিষয়ে ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা সীমা লঙ্ঘন ছাড়া আর কিছু নয়। তবে ফরয নামাযের মত গুরুত্বসহকারে নফল নামায ও তাহাজ্জুদ ইত্যাদি জামা'আত সহকারে পড়বে না। বৎসরের বিশেষ বিশেষ বরকতমন্ডিত রজনীসমূহে নফল নামায জামা'আত সহকারে আদায় করতে অসুবিধা নাই। এ সব নামায একা একা পড়তেও অসুবিধা নাই। (যুগ জিজ্ঞাসা)

রমযান শরীফে উমরাহ্'র ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা 'আব্দুল্লাহ্ ইবনে 'আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, হুযূর আক্বদাস সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান- রমযানে উ'মরাহ্ পালন করা আমার সাথে হজ্জ পালন করার সমতুল্য। (বোখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ শরীফ)

তাঁরই থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মক্কা মুকার্‌রমায় রমযান মাস পেলো, রোযা রাখলো এবং রাতে যথাসম্ভব জেগে ইবাদত করলো, আল্লাহ্ তার জন্য অন্য জায়গার এক লক্ষ রমযানের সাওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন। আর প্রতিদিন একটা গোলাম আযাদ করার সাওয়াব, প্রতি রাতে একটা গোলাম আযাদ করার সাওয়াব, প্রতিদিন জিহাদে ঘোড়-সাওয়ার দেয়ার সাওয়াব এবং প্রতিটি দিনে ও রাতে নেকী লিপিবদ্ধ করবেন। (ইবনে মাজাহ্ শরীফ)

আহা! আমাদের যদি রমযান মাসে মক্কা মুকার্‌রমায় অতিবাহিত করার ও উমরাহ্ আদায়ের সৌভাগ্য হয়ে যেতো! আর তাতে প্রতিমুহূর্ত ইবাদত করার সামর্থ্য হয়ে যেতো! তারপর রমযান অতিবাহিত করে, সাথে সাথে ঈদ উদযাপনের জন্য আমাদের প্রিয় আক্বা (মুনিব) সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম-এর নূরানী রওযায় হাযির হয়ে 'ঈদী' (ঈদের বখ্‌শিশ) ভিক্ষা চাওয়ার সৌভাগ্য হতো! আর তাঁর নূরানী হাত থেকে যদি আমরা গুনাহগারগণ তা পেতাম!

রমযান শরীফে যিক্‌রে ইলাহীর ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক্বে আ'যম রদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, মোস্তফা জানে রহমত সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান,

ذَاكِرُ اللهِ فِىْ رَمَضَانَ يُغْفَرُ لَهٗ وَسَائِلُ اللهِ فِيْهِ لَا يَخِيْبُ .

উচ্চারণঃ যা-কিরুল্লা-হি ফী রমাদ্বা-না ইয়ুগ্‌ফারু লাহূ ওয়া সা-য়িলুল্লাহি ফীহি লা-ইয়াখীব।

অর্থাৎ– রমযান মাসে আল্লাহ্‌র যিক্‌রকারীকে ক্ষমা করা হয়, আর তাতে আল্লাহ্‌র

দরবারে প্রার্থনাকারী নিরাশ হয় না। (শু'আবুল ঈমান, খণ্ড-২)

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম নাখ্'ঈ রহমাতুল্লাহি তা'আলা 'আলায়হ্ বলেন, রমযান মাসে একদিন রোযা রাখা (অন্য সময়) এক হাজার রোযা রাখার চেয়ে উত্তম। রমযান মাসে একবার তাসবীহ্ পাঠ করা (অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ্ ইত্যাদি যিকর করা) ওই মাস ব্যতীত অন্য মাসে এক হাজার বার তাসবীহ্ পাঠ করার চেয়ে উত্তম। রমযান মাসে এক রাক'আত নামায পড়া, রমযান ব্যতীত অন্য মাসের এক হাজার রাক্'আত অপেক্ষাও উত্তম। (আদ্দুর্‌রুল মানসুর, খণ্ড-১)

রমযান শরীফে মৃত্যুবরণের ফযীলত

কিছু সংখ্যক 'আলিম বলেন, যে ব্যক্তি রমযানে মৃত্যুবরণ করে তাকে কবরে প্রশ্নও করা হয় না। (তাফসীরে না'ঈমী, খণ্ড-২)

কিছু সংখ্যক সম্মানিত মুহাদ্দিস রহিমাহুমুল্লাহ্-এর অভিমত হচ্ছে, যে মু'মিন এ মাসে মৃত্যুবরণ করে, সে সোজা জান্নাতে প্রবেশ করে। তার জন্য যেনো দোযখের দরজা বন্ধই। (আনীসুল ওয়া'ইযীন)

হযরত সায়্যিদাতুনা মা 'আয়িশা সিদ্দীক্বাহ্ রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহা থেকে বর্ণিত, শময়ে বযমে হিদায়াত সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যার রোযা পালন অবস্থায় মৃত্যু হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত রোযার সাওয়াব দান করবেন।

(কানযুল উম্মাল, খণ্ড-৮)

সুতরাং কেউ রোযা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তাকে তালক্বীন করবেন, অর্থাৎ তার সম্মুখে ইসতিগ্‌ফার ও কালিমা পাঠ করবেন, তবে তাকে পড়াতে বলবেন না। আর তাকে পানি পান করাবেন না। তাহলে তিনি এ ফযীলত থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।

রমযান শরীফে ক্বোরআন তিলাওয়াতের ফযীলত

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর রদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন; ক্বিয়ামতে রোযা এবং ক্বোরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, "ওহে আমার রব! আমি তাকে দিনের বেলায় পানাহার থেকে বিরত রেখেছি। অতএব, তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ ক্ববূল করো"। ক্বোরআনুল করীম বলবে, "তাকে আমি রাতের বেলায় নিদ্রা হতে বিরত রেখেছি। কাজেই তার পক্ষে আমার সুপারিশ ক্ববূল করো"। সুতরাং (আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে) উভয়ের সুপারিশ ক্ববূল করা হবে। (মিশকাত, গাউসিয়া তারবিয়াতী নেসাব)

হযরত 'আয়িশা সিদ্দীক্বা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহা থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

নামাযের অভ্যন্তরে ক্বোরআন তিলাওয়াত করা নামাযের বাইরে তিলাওয়াতের চেয়ে উত্তম। আর নামাযের বাইরে ক্বোরআন তিলাওয়াত করা তাসবীহ ও তাকবীরের চেয়ে উত্তম, তাসবীহ পাঠ করা সাদাক্বাহ্ করা হতে উত্তম, সাদাক্বাহ্ করা রোযা হতে উত্তম আর রোযা দোযখ থেকে বাঁচার ঢালস্বরূপ। (বায়হাক্বী শরীফ, গাউসিয়া তারবিয়াতী নেসাব) রমযান মাসে ক্বোরআন শরীফ পুনরাবৃত্তি করা অথবা ক্বোরআন মজীদ পরস্পর পরম্পরকে শুনানো রসূলে পাক সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতও, হযরত জিব্রাইল 'আলাইহিস সালাম-এর সুন্নাতও। (মিরআত, খন্ড-৩) এ তিলাওয়াত বিশেষ করে ই'তিক্বাফের সময় হতো। (মিরক্বাত) হুযূরে আনওয়ার সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম প্রথম থেকে পূর্ণ ক্বোরআন জানতেন। ক্বোরআন নাযিল হওয়াতো উম্মতের উপর বিধানাবলী জারী (কার্যকর) করার জন্যই ছিলো। কেননা, প্রত্যক রমযানে হুযূরে আনওয়ার সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম পূর্ণ ক্বোরআন শুনেছেন ও হযরত জিব্রাইল 'আলাইহিস সালাম কে শুনিয়েছেনও। অথচ তখনো পূর্ণ ক্বোরআন মজীদ অবতীর্ণ হয়নি। নাযিল হওয়ার পূর্ণতাতো হুযূরে আনওয়ার সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম এর ওফাত শরীফের স্বল্পকাল পূর্বেই হয়েছে। (মিরক্বাত)

রমযান শরীফে ইলমে দ্বীন অর্জনের ফযীলত

সরওয়ারে দো'আলম সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি রমযান মাসে ইল্‌মে দ্বীন (শিক্ষার) মাজলিসে অংশগ্রহণ করবে, তার আমলনামায় (তার) প্রতিটি কদমের বিনিময়ে এক বৎসরের ইবাদতের সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয় এবং সে আরশের নিচে আমার সাথে থাকবে"। (কিয়া আ-প জা-নতে হ্যাঁয়, পৃষ্ঠা-৩৬০)

রমযান শরীফে মসজিদ আলোকিত করার ফযীলত

হযরত আবূ হোরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার কোন মসজিদকে রমযান মাসে আলোকিত করবে, তাঁর জন্য কবরে একটি নূর হবে ওই মসজিদে নামাযীদের ন্যায় সাওয়াব তাঁর আমালনামায় লিপিবদ্ধ করা হবে। আর সাধারণ ফিরিশতা ও 'আরশবহনকারী ফিরিশতাগণ যতক্ষণ ওই মসজিদ থাকবে, তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। (জায়রুল 'আবিদীন)

রমযান শরীফে তারাভীহ্'র ফযীলত

ক্বিয়ামতে রমযান ও ক্বোরআন রোযাদারের জন্য সুপারিশ করবে। রমযান বলবে, ওহে আমার মুনিব! আমি তাকে দিনের বেলায় পানাহার থেকে বিরত

রেখেছিলাম। আর ক্বোরআন আরয করবে, ওহে মহান রব! আমি তাকে তিলাওয়াত ও তারাভীহ্'র মাধ্যমে ঘুমাতে দিইনি। (তাফসীরে না'ঈমী, খণ্ড-২)

তারাবীহ্'র নামায বিশ রাক্'আত। হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আ'যম রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু-এর শাসনামলে বিশ রাক'আতই পড়া হতো।

(আস্ সুনানুল কুবরা, বায়হাক্বী, খণ্ড-৪)

তারাভীহ্ প্রত্যেক বিবেকবান ও প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান নর-নারীর জন্য সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। সেটা বর্জন করা জায়িয নয়। (দুররে মুখতার, খণ্ড-২)

তারাভীহ্'র জামা'আত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ 'আলাল কিফায়া। সুতরাং যদি মসজিদের সবাই ছেড়ে দেয় তবে সবাই তিরস্কারযোগ্য কাজ করলো। (অর্থাৎ- মন্দ কাজ করলো) আর যদি কয়েকজন লোক জামা'আত সহকারে পড়ে, তবে যারা একাকী পড়েছে, তারা জামা'আতের ফযীলত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। (হিদায়া, খণ্ড-১)

নোটঃ এক্ষেত্রে ইশার ফরয মসজিদে জামা'আতে পড়া ওয়াজিব। (নামায কে আহকাম)

ইশার ফরয নামায পড়ার পর থেকে সুবহে সাদিক্ব পর্যন্ত তারাভীহ্'র নামাযের সময়। ইশার ফরয আদায় করার পূর্বে পড়ে নিলে বিশুদ্ধ হবেনা। (আলমগীরী, খণ্ড-১)

ইশার ফরযের পর বিতরের পরও তারাভীহ্ পড়া যায়। (দুররে মুখতার, খণ্ড-২)

রমযান শরীফে বিত্‌র জামা'আত সহকারে পড়া উত্তম। কিন্তু যে ব্যক্তি ইশার ফরয জাম'আত ছাড়া পড়ে, যে যেন বিত্‌রও একাকী পড়ে। (বাহারে শরীয়ত) তবে পড়ে নিলেও অসুবিধা নেই। কিন্তু পূর্ব নিয়ম মুস্তাহাব তথা উত্তম। (সগীরী, যুগ জিজ্ঞাসা)

কিছু সংখ্যক মুক্বতাদী বসে থাকে। যখন ইমাম রুকূ' যাবার উপক্রম হন তখন দাঁড়িয়ে যায়। এটা মুনাফিক্বদের মতো কাজ। যেমন, সূরা নিসার ১৪২নং আয়াতে রয়েছে–

وَ اِذَا قَامُوْۤا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى

কানযুল ঈমান শরীফের অনুবাদঃ এবং (মুনাফিক্ব) যখন নামাযে দন্ডায়মান হয় তখন দাঁড়ায় অলসভাবে।

তারাভীহ্সহ যে কোন নামাযে এমন করা মাকরূহ্। ফাতাওয়ায়ে শামী-তে বলা হয়েছে, এ ধরণের কাজ করা মাকরূহে তাহরীমী। গায়াতুল আওতার কিতাবে এমন কাজকে মুনাফিক্বের কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব এ ধরণের কাজ করা নিষেধ। (আলমগীরী,বাহরুর রায়েক) ফরয নামাযগুলোতে থেমে থেমে ক্বিরাআত সম্পন্ন করবেন। আর তারাভীহতে মাঝারী ধরনের আর রাতের নফলগুলোতে তাড়াতাড়ি পড়ার অনুমতি রয়েছে; কিন্তু এমনি পড়বেন যেন বুঝা যায়। অর্থাৎ কমপক্ষে মদ্দ-এর যে পর্যায় ক্বারীগণ রেখেছেন, তা আদায় করবেন। অন্যথায় হারাম। কেননা, তারতীল সহকারে (অর্থাৎ খুব থেমে থেমে)

কোরআন পড়ার নির্দেশ রয়েছে। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, খণ্ড-২)
প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের তারাভীহ্ (বরং যেকোন নামায, এমনকি নফলও) অপ্রাপ্ত বয়স্কের পেছনে বিশুদ্ধ হয়না (রদ্দুল মুহতার)। তবে প্রাপ্ত বয়স্ক কিন্তু দাড়ি গজায়নি তবে তার পেছনে ইকতিদা করা মাকরূহে তানযীহী কিন্তু দাঁড়ি একমুষ্ঠি হওয়ার পূর্বে যে ছাটে, সে ফাসিক্বে মু'লান। তার পেছনে ইক্বতিদা (যে কোন নামাযে) মাকরূহে তাহরীমী। এ নামায পুনরায় পড়ে দেয়া ওয়াজিব। (মালফূযাতে আ'লা হযরত ও যুগ জিজ্ঞাসা থেকে সংকলিত)
তারাভীহ্ ছুটে গেলে তার ক্বাযা নেই। (দুররে মুখতার, খণ্ড-২)

তারাভীহ্'র পারিশ্রমিক নেয়া কেমন?

মৃত মুসলমানের ঈসালে সাওয়াবের জন্য পারিশ্রমিক (হাদিয়া) দিয়ে খতমে কোরআন এবং আল্লাহ্র যিক্র (তাহলীল) পড়ানোর ব্যাপারে আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা রহমাতুল্লাহি তা'আলা 'আলায়হ্ ফাতওয়া প্রদান করেন, যদি লোকেরা চায় যে, ঈসালে সাওয়াবও হোক শরীয়তসম্মত বৈধ পন্থাও অর্জিত হোক, তবে সেটার পদ্ধতি হচ্ছে- যারা খতম পড়ছে তাদেরকে ঘন্টা (দু'ঘন্টার জন্য) এজন্য নিয়োগ করে নিন! আর বেতনও ততক্ষণের জন্য প্রত্যেকের নির্ধারিত করে দিন। যেমন, যিনি পড়াবেন তিনি বলবেন, আপনাকে আজ আমি অমুক সময় থেকে অমুক সময়ের জন্য এ হাদিয়ায় নিয়োগ করলাম। আমি যে কাজই চাই আপনাকে দিয়ে করাব। তিনি বলবেন, আমি ক্বুবূল করলাম। এখন তিনি ততটুকু সময়ের জন্য নিয়োজিত হলেন। এখন তিনি যে কাজই চান, করাতে পারেন। এরপর তাকে বলবেন, অমুক মৃতের জন্য কোরআন মজীদ এতটুকু, কিংবা এতবার কালিমায়ে তায়্যিবাহ, সূরা, দুরূদ শরীফ পড়ে দিন। এটা হচ্ছে বৈধ পন্থা। (ফাতাওয়ায়ে রযাভিয়্যাহ্, খণ্ড-১০)
অনুরূপ- মসজিদ কমিটির লোকেরা পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে হাফিয সাহিবকে রমযান শরীফে তারাভীহ্'র জন্য সময় নির্ধারণ করে নিয়োগ দেয়ার সময় বলবেন, আমরা যে কাজেই করতে বলি তা করতে হবে। বেতনের পরিমাণ বলে দেবেন। তিনি প্রস্তাব গ্রহণ করলে তজ্জন্য নিয়োজিত হয়ে গেলেন। এখন তার সাথে নির্ধারিত সময়ে (ইশা থেকে দু'ঘন্টা পর্যন্ত) তিনি তারাভীহ্ পড়িয়ে দেবেন। একথাও মনে রাখবেন যে, যখন হাফিয সাহিবকে কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করেছেন, তখন একথা বলে দেয়া বৈধ নয়, আমরা যা উপযুক্ত হবে তাই দিয়ে দেবো; বরং সুস্পষ্টভাবে অংকের পরিমাণ বলে দিতে হবে। আর তিনিও রাজী হবেন। এখন এ পরিমাণ টাকা অবশ্যই আদায় করতে হবে। অবশ্য যদি নিজেদের ইচ্ছানুসারে নির্ধারিত অংকের চেয়ে বেশী দেন, তবে তাও জায়িয।

যদি হাফিয সাহিব বিশুদ্ধ নিয়্যত সহকারে (কিছু পাওয়ার আশা একেবারে অন্তরে না রেখে) পরিস্কার ভাষায় বলে দেন, আমি কিছুই নেবো না, কিংবা যিনি পড়াবেন তিনি বলে দেন, কিছুই দেবো না। তারপরও যদি কমিটি বা লোকেরা তাকে হাদিয়া স্বরূপ কিছু প্রদান করেন, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। এটা বৈধ।
যদি শর্তাবলী বিশিষ্ট (প্রাপ্তবয়স্ক, দাড়ি একমুষ্ঠির পূর্বে কর্তনকারী না হওয়া, অবশ্য না ছাঁটলে একমুষ্ঠি হওয়ার জরুরী নয়।) যদি হাফিয পাওয়া না যায় কিংবা অন্য কোন কারণে খতম করা সম্ভব না হয়, তবে তারাভীহতে যেকোন সূরা পড়ে নেবেন। 'আলাম তারা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত ২বার করে (অথবা প্রথম রাক'আতে সূরা ফীল ২য় রাক'আতে সূরা ইখলাস, ৩য় রাক'আতে সূরা কোরাইশ, ৪র্থ রাক'আতে সূরা ইখলাস, এভাবে ২ বার) করে পড়বেন। এভাবে ২০ রাক'আত স্মরণ রাখাও সহজ হবে। (আলমগীরী, খণ্ড-১)
প্রতি ৪ রাক'আতের পর ততটুকু সময় পর্যন্ত বিশ্রামের জন্য বসা মুস্তাহাব, যতক্ষণ ৪ রাক'আত পড়তে লেগেছে। এটাকে তারভীহাহ্ বলে। (প্রাগুক্ত)
এতে ইচ্ছা হলে বসে থাকুক কিংবা যিক্র, দুরূদ ও তিলাওয়াত করুক, অথবা একাকী নফল পড়ুক। (দুররে মুখতার, খণ্ড-২)

নিম্নলিখিত তাসবীহও পড়তে পারে

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَآءِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ.

উচ্চারণ ঃ সুবহা-না যিল মুলকি ওয়াল মালাক্-তি সুবহা-না যিল্ ইয্যাতি ওয়াল আ'যমাতি ওয়াল হায়বাতি ওয়াল ক্বুদরাতি ওয়াল কিব্রিয়া-য়ি ওয়াল জাবারূ-তি সুবহা-নাল মালিকিল হায়্যিল্ লাযী লা-ইয়ানা-মু ওয়ালা- ইয়ামূ-তু আবাদান আবাদা সুব্বূহুন্ কুদ্দূসুন রব্বুনা- ওয়া রব্বুল মালা-ইকাতি ওয়াররূহ্।
অনুবাদ ঃ পবিত্রতা রাজ্য ও মহারাজ্যের মালিকের, পবিত্রতা সম্মান, মহত্ব, ভক্তি প্রযুক্তভয়; ক্ষমতা, বড়ত্ব ও দাপটের মালিকের, পবিত্রতা রাজাধিরাজ, চিরঞ্জীবের, যিনি না ঘুমান, না কখনো তাঁর মৃত্যু হবে, যিনি মহা পবিত্র, আমাদের রব এবং ফিরিশতাদের রব, বিশেষ করে জিব্রাইলের ।
আমাদের দেশে বর্তমানে সুন্নী মুসলমানদের মসজিদে যে নিয়ম রয়েছে, অর্থাৎ উপরোল্লিখিত তাসবীহ পড়ে মুনাজাত করে নেয়া, তাও বৈধ।

প্রতি চার রাক'আতের পর এভাবে মুনাজাত করতে পারেন

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ يَا خَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا كَرِيْمُ يَا سَتَّارُ يَا رَحِيْمُ يَا جَبَّارُ يَا خَالِقُ يَا بَارُّ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ .

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা ইন্না- নাসআলুকাল জান্নাতা ওয়া না'ঊ-যুবিকা মিনান্না-র ইয়া- খা-লিকাল জান্নাতি ওয়ান্না-রি বিরাহমাতিকা ইয়া-আযী-যু, ইয়া-গফ্ফা-রু, ইয়া-কারীমু, ইয়া-সাত্তা-রু, ইয়া- রহী-মু ইয়া- জাব্বা-রু, ইয়া- খা-লিকু, ইয়া-বা-রুরু, আল্লা-হুম্মা আজিরনা ওয়া খাল্লিস্না মিনন্না-রি, ইয়া মুজী-রু, ইয়া মুজী-রু, ইয়া মুজী-রু, বি-রহমাতিকা ইয়া-আরহামার র-হিমী-ন।

নোট ঃ দো'আর আগে পরে অবশ্যই দুরূদ শরীফ পাঠ করবেন।

শুরুতে রমযান শরীফে ই'তিকাফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদাতুনা 'আয়িশা সিদ্দীক্বা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহা বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম রমযানুল মুবারকের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করতেন– এ পর্যন্ত যে, আল্লাহ্ তা'আলা হুযূরকে (জাহেরী) ওয়াফাত দান করেছেন। তারপর হুযূরের অনুসরণে তাঁর পবিত্র বিবিগণ (রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুন্না) ই'তিকাফ করতে থাকেন।

ই'তিকাফের অগণিত ফযীলত রয়েছে, কিন্তু 'আশিক্বে রসূলদের জন্য এতটুকু কথাই যথেষ্ট যে, তা সুন্নাত। সুতরাং জীবনে একবার হলেও দশদিনের ই'তিকাফ রমযান শরীফের শেষ দশ দিনে মুসলমান ভাইয়েরা মসজিদে এবং মুসলিম রমণীরা ঘরের নির্দিষ্ট জায়গায় করে নেয়া উচিত।

হযরত সায়্যিদুনা 'আলী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু থেকে বর্ণিত, মী'রাজের দুলহা সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ اِعْتَكَفَ فِيْ رَمَضَانَ كَانَ كَحَجَّتَيْنِ وَعُمْرَتَيْنِ .

উচ্চারণঃ মান ই'তিকাফা ফী রমাদ্বানা কা-না কাহাজ্জাতাইনি ওয়া উ'মরাতাইন।

অর্থঃ যে ব্যক্তি রমযান মাসে ই'তিকাফ করলো, তা দু'হজ্জ ও দু'উমরার মতো হলো। (শুআবুল ঈমান, খণ্ড-৩)

হযরত মা 'আয়িশা সিদ্দীক্বাহ রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহা থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنْ اِعْتَكَفَ اِيْمَانًا وَّ اِحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ .

উচ্চারণ ঃ মান্ ই'তিকাফা ঈমানাওঁ ওয়া ইহ্তিসা-বান গুফিরা লাহূ মা-তাক্বাদ্দামা মিন যাম্বিহ্।

অর্থঃ যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে ই'তিকাফ করে তার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (জামি' সগীর)

হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি তা'আলা 'আলায়হ্ থেকে বর্ণিত, ই'তিকাফকারী প্রতিদিন এক হজ্জের সাওয়াব পায়। (দুররে মানসূর, খণ্ড-১)

ই'তিকাফ অর্থ ধর্ণা দেয়া। অর্থাৎ ই'তিকাফকারী আল্লাহ্র দরবারে তার ইবাদত করার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকবে।

মসজিদে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য ই'তিকাফের নিয়্যতে অবস্থান করাকে ই'তিকাফ বলে। এর জন্য মুসলমান বিবেকবান, জানাবাত (ওই নাপাকী, যার কারণে গোসল ফরয হয়), হায়য্ ও নিফাস থেকে পবিত্র হওয়া পূর্বশর্ত। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া শর্ত নয়, বরং অপ্রাপ্ত বয়স্ক, যে পার্থক্য শক্তির অধিকারী, যদি ই'তিকাফের নিয়্যতে মসজিদে (মহিলা ঘরের নির্দিষ্ট নামাযের স্থানে) অবস্থান করে, তবে সেই ই'তিকাফও বিশুদ্ধ। (আলমগীরী, খণ্ড-১)

ই'তিকাফ তিন প্রকার

(১) ওয়াজিব ই'তিকাফ (২) সুন্নাত ই'তিকাফ (৩) নফল ই'তিকাফ।

ওয়াজিব ই'তিকাফ হলোঃ ই'তিকাফের মান্নত করা। অর্থাৎ মুখে বললো, আল্লাহ্র জন্য অমুক দিন কিংবা এতোদিনের জন্য ই'তিকাফ করবো। সুতরাং এখন যতদিনের জন্য বললো, ততদিনের ই'তিকাফ করা ওয়াজিব হয়ে গেলো। একথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখবেন যে, যখনই যে কোন ধরণের মান্নতই করা হয়, তখন তাতে মুখে মান্নত শব্দটি উচ্চারণ করা পূর্বশর্ত, শুধু মনে মনে মান্নতের ইচ্ছা কিংবা নিয়্যতকরণে মান্নত বিশুদ্ধ হয় না। (বিশুদ্ধ নয় এমন মান্নত পূরণ করা ওয়াজিব নয়) (দুররে মুখতার, খণ্ড-৩)

ওয়াজিব ই'তিকাফঃ মান্নতের ই'তিকাফে রোযাও পূর্বশর্ত। অর্থাৎ রোযার মান্নত না করলেও ওয়াজিব ই'তিকাফে রোযাও রাখতে হবে।

সুন্নাত ই'তিকাফ ঃ রমযান শরীফের শেষ দশ দিনের ই'তিকাফ সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ 'আলাল কিফায়াহ' (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, খণ্ড-৩) অর্থাৎ গোটা শহরে কোন একজন করে নিলো। তখন সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে গেলো। আর যদি কেউ না করে, তখন সবাই অপরাধী হলো। (বাহারে শরীয়ত, খণ্ড-৫)

এ ই'তিকাফের মধ্যে এটাও জরুরী যে, রমযান শরীফের ২০ তারিখে সূর্য অস্তমিত হবার আগে ভাগে মসজিদে ই'তিকাফের নিয়্যতে সহকারে উপস্থিত থাকবে। আর ২৯ শে রমযান চাঁদ দেখার পর কিংবা ৩০ শে রমযান সূর্যাস্তের

পর মসজিদ থেকে বের হবে। (প্রাগুক্ত)

এ ই'তিকাফে মনে মনে নিয়্যত করে নেয়াই যথেষ্ট, মুখে বলা পূর্বশর্ত নয়। অবশ্য, নিয়্যত অন্তরে হাযির থাকা জরুরী। সাথে সাথে মুখেও এভাবে বলে নেয়া উত্তম– আমি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য রমযান শরীফের শেষ দশদিনের সুন্নাত ই'তিকাফের নিয়্যত করলাম।

নফল ই'তিকাফঃ মান্নত ও সুন্নাতে মুআক্কাদাহ ব্যতীত যেই ই'তিকাফ করা হয়ে থাকে তা মুস্তাহাব (নফল) ও সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদাহ। (বাহারে শরীয়ত, খণ্ড-৫) যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, ই'তিকাফের নিয়্যত করে নেবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদে থাকবেন, কিছু পড়ুন কিংবা না-ই পড়ুন, সাওয়াব পেতেই থাকবেন। এর জন্য না রোযা পূর্বশর্ত, না কোন সময়ের শর্তারোপ করা হয়। যখন মসজিদ থেকে বের হয়ে আসবে, তখনই ই'তিকাফ শেষ হয়ে যাবে। মনে মনে যদি এ ইচ্ছা করে নেন– আমি সুন্নাত ই'তিকাফের নিয়্যত করলাম, এটাই যথেষ্ট। সম্ভব হলে আরবী ভাষায় এ নিয়্যত মুখস্থ করে নেবেন, এটা বেশী উত্তম।

نَوَيْتُ سُنَّةَ الْاِعْتِكَافِ .

উচ্চারণ ঃ নাওয়ায়তু সুন্নাতাল ই'তিকাফ।

অর্থঃ আমি সুন্নাত ই'তিকাফের নিয়্যত করলাম। (আল মালফূয, খণ্ড-২)

মসজিদে নববী ('আলা সাহিবিহিস্ সলাতু ওয়াস্ সালাম)-এর প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ দরজা 'বাবুর রহমাহ্' দিয়ে প্রবেশ করলে সম্মুখেই সুতূন (স্তম্ভ) মুবারকের উপর এটা প্রাচীন যুগ থেকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রয়েছে।

জরুরী ফাতওয়া

ফাতাওয়ায়ে শামী-এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি কেউ মসজিদে পানাহার ও শয়ন করতে চায়, তবে সে ই'তিকাফের নিয়্যত করে নেবে। কিছুক্ষণ আল্লাহ্র যিক্র করে নেবে, তারপর যা চায় (পানাহার, শয়ন) করবে।

(রদ্দুল মুহতার, খণ্ড-২)

ই'তিকাফের মাসাইল

ই'তিকাফের মধ্যভাগে দু'টি কারণের ভিত্তিতে মসজিদের ঘেরার বাইরে যাবার অনুমতি রয়েছেঃ (১) শরীয়তগত প্রয়োজন ও (২) স্বভাবগত প্রয়োজন ।

শরীয়তগত প্রয়োজন

যেসব বিধান ও বিষয় পালন করা শরীয়তগতভাবে জরুরী হয়, আর ই'তিকাফকারী ই'তিকাফের স্থানে সেগুলো পালন করতে পারেন না, সেগুলোকে শরীয়তগত প্রয়োজন বলে। যেমন– জুমু'আহ্ ও আযান ইত্যাদি।

* যদি মিনারার রাস্তা মসজিদের বাইরে হয়, তবুও আযানের জন্য

ই'তিকাফকারীও যেতে পারবেন। (রদ্দুল মুহতার)

* এমন মসজিদে ই'তিকাফ করছেন, যাতে জুমু'আহ্'র নামায হয়না। তাহলে অন্য মসজিদে যেখানে জুমু'আহ্'র নামায হয়, এমন মসজিদে জুমু'আহ্'র নামাযের জন্য যাওয়া জায়িয। এতটুক পূর্বে বের হবে যে খোতবা শুরু হবার পূর্বে পৌঁছে চার রাক্'আত ক্বাব্লাল জুমু''আহ্ সুন্নাত পড়তে পারেন। ফরযের পরও এতটুক দেরী করতে পারবে যে, চার কিংবা ছয় রাক্'আত পড়ে নেবেন। আর যদি তদপেক্ষা বেশী অবস্থান করে, বরং অবশিষ্ট ই'তিকাফ সেখানেই পুরো করে নেয়, তবুও ই'তিকাফ ভঙ্গ হবেনা; কিন্তু জুমু'আহ্'র নামাযের পর ছয় রাক্'আতের বেশী সময় অবস্থান করা মাকরূহ্। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

* যদি এক মহল্লার এমন মসজিদে ই'তিকাফ করলো, যাতে জামা'আত হয় না, (এমন ইবাদতখানা যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত আযান ও জামা'আত সহকারে নামায হয়না, মানুষ একাকী নামায পড়ে চলে যায়) তবে এখন জাম'আতের জন্য বের হবার অনুমতি নেই। কেননা, এখন উত্তম হচ্ছে– জামা'আত ছাড়া ওই মসজিদেই নামায পড়া। (জাদ্দুল মুমতার)

ফিনায়ে মসজিদে গেলেও ই'তিকাফ ভঙ্গ হয় না। ই'তিকাফকারী কোন প্রয়োজন ছাড়াও ফিনায়ে মসজিদে যেতে পারে। ফিনায়ে মসজিদ বলতে বুঝায়- ওইসব জায়গা, যেগুলো মসজিদের ঘেরা (সাধারণ পরিভাষায় যাকে মসজিদ বলা হয়)'র মধ্যে রয়েছে, আর মসজিদের প্রয়োজন হলে মসজিদের জন্যই ব্যবহৃত হয়। যেমন– মিনারা, ওযূখানা, শৌচাগার, গোসলখানা, মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসা ও ইমাম ও মু'আয্যিন সাহেব প্রমূখের হুজুরাগুলো, জুতো খুলে রাখার জায়গা ইত্যাদি। যার উপর গোসল ফরয হয়েছে, সে সেখানে যেতে পারবে। আর ই'তিকাফকারী বিনা প্রয়োজনেও এসব জায়গায় যেতে পারে। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান রহমাতুল্লাহি তা'আলা 'আলায়হ্ বলেন, বরং যখন ওই মাদ্রাসাগুলো মসজিদ সংলগ্ন ও মসজিদের সীমানার ভিতর থাকে, সেগুলোর মধ্যে রাস্তা অন্তরাল না হয়, শুধু এক দেয়াল দ্বারা আঙ্গিনাগুলোকে পৃথক করে দিয়ে থাকে, তাহলে সেগুলোতে যাওয়া মসজিদের বাইরে যাওয়া নয়। এমনকি এমন জায়গায় ই'তিকাফকারীর যাওয়া বৈধ; কারণ, সে যেনো মসজিদেরই একটা অংশে গেছে। (ফাতাওয়ায়ে রযাভিয়্যাহ শরীফ, বাহারে শরীয়ত ও ফাতাওয়ায়ে আমজাদিয়াহ থেকে সংকলিত)

স্বভাবগত প্রয়োজন

ওইসব প্রয়োজন যা পূরণ করা ব্যতীত কোন উপায় নেই। যেমন– প্রস্রাব কিংবা পায়খানা করা ইত্যাদি।

* মসজিদের ঘেরার ভিতর যদি প্রস্রাব ইত্যাদির জন্য কোন জায়গা নির্দিষ্ট না

থাকে, তবে এসব কাজের জন্য মসজিদ থেকে বের হয়ে যেতে পারে।
(দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

* যদি মসজিদে (ঘেরার ভিতর) ওযূখানা কিংবা হাওয (কমপক্ষে ১০০ বর্গ হাত, এর চেয়ে ছোট হাওযের পানিতে ওযূর নিয়্যতে ওযূবিহীন হাতও যদি দেয়, তবে ওই হাওযের পানি ব্যবহৃত পানির হুকুমের আওতায় আসবে, তখন ওই পানি পবিত্র থাকলেও তা দিয়ে ওযূ, গোসল, (নাপাক বস্তু পবিত্র করা জায়িয হবেনা) না থাকে, তাহলে মসজিদ থেকে ওযূর জন্য বাইরে যেতে পারে; কিন্তু এটা তখনই, যখন কোন বড় কড়াই কিংবা টবের মধ্যে এভাবে ওযূ করা সম্ভবপর না হয় যে, ওযূর পানির কোন ছিটকে (মূল) মসজিদে পড়ে না। (রদ্দুল মুহতার)

* স্বপ্নদোষ হলে যদি মসজিদের ঘেরার ভিতর গোসলখানা না থাকে এবং কোনমতে মসজিদের অভ্যন্তর (ফিনায়ে মসজিদে) গোসল করা সম্ভব না হয় তবে জানাবতের গোসলের জন্য মসজিদ থেকে বের হয়ে যেতে পারে। (রদ্দুল মুহতার) সাধারণ গোসলের জন্য মসজিদের বাইরে যাওয়ার অনুমতি নেই। এক্ষেত্রে ভেজা তোয়ালে ইত্যাদি দিয়ে শরীর মুছে নেবেন, সুগন্ধী ব্যবহার করবেন।

* (ই'তিকাফ রত অবস্থায়) জুমু'আহ্‌র গোসলের জন্য কোন বর্ণণা পাওয়া যায়নি। নফল গোসল ও গরমের গোসলের জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়িয নয়। কেবল প্রস্রাব, পায়খানা ও জানাবাতের গোসলের জন্য বের হতে পারবে। (প্রাগুক্ত) মিরক্বাত প্রণেতা বলেছেন, যদি মসজিদে (ই'তিকাফ) থাকা অবস্থায় কেউ টপ ইত্যাদিতে এভাবে গোসল করে (করতে পারে) যে, মসজিদে ব্যবহৃত পানি একেবারে পড়ে না, তাহলে সেখানে করবে, গোসলখানায় যাবে না।

* হাজত পুরো করার জন্য গিয়ে পবিত্রতা অর্জন করে তাৎক্ষণিকভাবে চলে আসবে। অবস্থান করার অনুমতি নেই। (আলমগীরী থেকে সংকলিত)

* উপরোল্লিখিত প্রয়োজন ব্যতীত কোন উদ্দেশ্যে (জানাযার নামায, রোগের চিকিৎসার জন্য কেউ এসে নিজের কিংবা অন্য কারো জুতো চুরি করে পালানোর সময় তাকে ধরার জন্য মসজিদ থেকে বের হলে, কেউ জোর করে মসজিদের বাইরে নিয়ে গেলে, মামলার সাক্ষী দেয়ার জন্য, কোন মানুষ পানিতে ডুবে যাচ্ছে কিংবা আগুনে জ্বলছে, তাকে উদ্ধার করতে বের হলে, বাতাস ছাড়ার জন্য, ঘুমন্ত অবস্থায় হাঁটার রোগের কারণে ওই অবস্থায় চলতে চলতে বের হয়ে গেলে, কাপড় ও থালা-বাসন ধোয়ার জন্য, পানাহার, ধূমপান করা, (অজানা বশত কিংবা ভুল করে) ইত্যাদি। কোনও উদ্দেশ্যে কিংবা মসজিদের সীমানা থেকে বের হয়ে যায়, আর তা যদি এক মুহূর্তের জন্যও হয়, তবে তা দ্বারা ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। (মারাক্বীয়ুল ফালাহ, তাবয়ীনুল হাক্বাইক্ব, দুররে মুখতার ইত্যাদি থেকে সংকলিত)

* এছাড়া অজানা বশত কিংবা ভুল করে বাইরে গেলে, রোযা ভঙ্গ হয়ে গেলে, স্ত্রী সহবাস ইচ্ছাকৃত কিংবা ভুলবশতঃ করলে, তাতে বীর্যপাত না হলেও, (স্ত্রীকে চুম্বন-আলিঙ্গন ই'তিকাফ অবস্থায় না-জায়িয) যদি এর ফলে বীর্যপাত হয়ে যায়, প্রস্রাব করার জন্য বাইরে গেলে কর্জদাতা সেখানে ধরে রাখলে, কোন হতভাগা মুরতাদ্দ হয়ে গেলে, ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। এবং এর ক্বাযা আদায় করতে হবে।

হ্যাঁ ই'তিকাফ অবস্থায় কোন রোগ সৃষ্টি হলে, যার চিকিৎসা মসজিদের বাইরে যাওয়া ব্যতীত হতে পারে না, তখন বের হলে, পানিতে ডুবন্ত কিংবা আগুনে জ্বলন্ত মানুষকে উদ্ধার করতে বের হলে, যদি জানাযা এসে যায়, অন্য কেউ নামায আদায়কারীও নেই, তখন (মসজিদের সীমানার) বাইরে গিয়ে নামায পড়লে, কেউ জোর করে বাইরে নিয়ে গেলে, যদি তাৎক্ষণিক অন্য মসজিদে চলে যাওয়া সম্ভব না হয়, (এ অবস্থায় তাৎক্ষণিকভাবে অন্য মসজিদে চলে গেলে ই'তিকাফ ভঙ্গ হবে না) যদি নিজের প্রিয়জন, মুহরিম কিংবা স্ত্রীর মৃত্যু হয়ে যায়, তবে জানাযার নামাযের জন্য, কারো সাক্ষ্যের উপরই যদি ফয়সালা মওকূফ থাকে, তখন প্রাপকের প্রাপ্য বিনষ্ট হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য ই'তিকাফ ভঙ্গ করলে ই'তিকাফ তো ভঙ্গ হয়ে যাবে আর তার ক্বাযাও দিতে হবে। কিন্তু তার জন্য গুনাহ হবেনা। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার থেকে সংকলিত)

* যদি রোযার কথা স্মরণ না থাকে, আর ভুলবশতঃ কিছু পানাহার করে নিলো কিংবা এ অবস্থায় ওযূ গোসল করার সময় পানি ভিতরে চলে গেলো, এমতাবস্থায় না রোযা ভঙ্গ হলো, না ই'তিক্বাফ।

* স্ত্রী চুম্বন ও আলিঙ্গন করায় বীর্যপাত না হলে, তা না-জায়িয হওয়া সত্ত্বেও ই'তিকাফ ভঙ্গ হবেনা। (দুররে মুখতার)

* স্মরণ রাখবেন যে, যদি ই'তিকাফকারীর জন্য খাদ্য আনার মতো কেউ না থাকে, তবে তিনি খাদ্য আনার জন্য মসজিদের বাইরে যেতে পারেন; কিন্তু মসজিদে এনেই খাবেন। (আল বাহ্‌রুর রাইক্ব)

* পানাহারের কাজ সমাধার জন্য পানি আনার কেউ নেই। এমতাবস্থায় পানি আনার জন্য বাইরে যেতে পারবে, কিন্তু পান করবে মসজিদের ভিতর।

* যদি মসজিদের বাইরের শৌচাগার অপরিচ্ছন্ন হবার কারণে তা ব্যবহার করতে ইচ্ছে না হয়, তাহলে শৌচকর্ম সম্পাদনের জন্য নিজ ঘরে গেলে কোন ক্ষতি নেই। (রদ্দুল মুহতার)

তবে যদি তার দু'টি বাড়ী থাকে- একটা নিকটে, অপরটি দূরে, তাহলে নিকটতর বাড়ীতে যাবে। কিছু সংখ্যক মাশায়িখ রহিমাহুমুল্লাহ্‌ বলেন, (এমতাবস্থায়) দূরবর্তী বাড়ীতে গেলে ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। (আলমগীরী)

* টয়লেট, ওযূখানা ইত্যাদি (মসজিদের বাইরে হলে) তাতে যাবার সময় হাঁটতে

হাঁটতে সালাম ও জবাব, (প্রয়োজনীয়) কথাবার্তা বলার অনুমতি আছে; কিন্তু এজন্য যদি এক মুহূর্তের জন্যও থেমে যায়, তাহলে ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যায়।

* শৌচাগারে গেলো কিন্তু কেউ আগে থেকে ভিতরে থাকে, তখন মসজিদে ফিরে আসার প্রয়োজন নেই, বরং সেখানেই অপেক্ষা করবে।

* প্রস্রাব করার পর মসজিদের বাইরেই প্রয়োজন হলে, প্রস্রাব করার পর কোন ফোঁটা রুখে থাকলে, তা বের করার জন্য ডান পা বাম পায়ের উপর কিংবা বাম পা ডান পায়ের উপর রেখে চাপ দিলে, কাঁশি দিলে, টহল বা পায়চারী ইত্যাদির মাধ্যমে ইস্তিব্‌রাও করতে পারে। তবে ইস্তিবরা করার সময় ক্বিবলার দিকে মুখ করা কিংবা পিঠ ফেরানো না-জায়িয। (কানুনে শরীয়ত)

* মসজিদে পারিশ্রমিক না নিয়ে কোন রোগী দেখা, ঔষধ বলে দেয়া বরং ব্যবস্থাপত্র লিখে দেয়া বৈধ।

* লিখকের জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে লিখনের অনুমতি মসজিদে নেই। (আলমগীরী) নিজের কিংবা পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনে মসজিদে বেচাকেনা করা (শুধু) ই'তিকাফকারীর জন্য জায়িয। কিন্তু ব্যবসার কোন জিনিষ মসজিদে আনেত পারবে না। অবশ্য যদি স্বল্প জিনিষই হয়, যা মসজিদের জায়গা জুড়ে থাকেনা, তাহলে আনতে পারে। বেচাকেনাও শুধু প্রয়োজনের তাগিদে হওয়া চাই। সম্পদ আহরণ করার উদ্দেশ্যে হলে জায়িয নয়- চাই ওই মাল মসজিদের বাইরে থাকুক। (দুররে মুখতার)

* দর্জির জন্য মসজিদে বসে কাপড় সেলাই করার অনুমতি নেই। অবশ্য, শিশুদের বাধা প্রদান ও মসজিদের নিরাপত্তার (রক্ষণাবেক্ষণের) জন্য হলে তবে ক্ষতি নেই। (আলমগীরী)

* ই'তিকাফকারী মসজিদের আদবের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবেন।

* মসজিদের ভিতর কাঁচা পেঁয়াজ, রসুন, মূলা ইত্যাদি দুর্গন্ধ যুক্ত খাবার আহার করবেন না।

* দুর্গন্ধময় বস্ত্র, পোশাক ইত্যাদি ব্যবহার করবেন না।

* মসজিদে হাসবেন না।

হযরত সায়্যিদুনা আনাস ইবনে মালিক রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু থেকে বর্ণিত, শাহানশাহে বনী আদম সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اَلضَّحْكُ فِى الْمَسْجِدِ ظُلْمَةٌ فِى الْقَبْرِ ـ

অর্থাৎ- মসজিদে হাসলে ক্বরে অন্ধকার আসে। (জামি' সগীর)

যে হাসির আওয়াজ পাশের কেউ শুনে সেটাকে হাসি বলে। আর অট্টহাসি তো মসজিদে আরো বেশী নিষিদ্ধ। যেকোন সময় অট্টহাসি সুন্নাত নয়, মুচকি হাসা,

যাতে আওয়াজ হয় না যদিও দাঁত প্রকাশ পায় তাই পবিত্র সুন্নাত। মসজিদে মুচকি হাসা নিষেধ নয়।

* মসজিদকে কোনভাবে নোংরা করবেন না, বরং পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে খেয়াল রাখবেন। সম্ভব হলে লোবান, গোলাপজল, সুগন্ধি দ্বারা মসজিদকে সুবাসিত রাখবেন। এটা সুন্নাত ও সাওয়াবের কাজ।

* মসজিদে সজোরে হাঁটবেন না। হাঁচি আসলে আওয়াজ ক্ষীণ রাখার চেষ্টা করবেন। আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম মসজিদে সজোরে হাঁচি দেয়াকে অপছন্দ করতেন। অনুরূপভাবে ঢেকুরও চেপে রাখবেন। মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যখন সে 'হা' বলে তখন শয়তান হাসে। (যখীরায়ে দো'আ-এ খায়র)

* মুসলিম রমণীগণ (আপন ঘরে) ই'তিকাফ পালনকালে আপন জায়গায় বসে সেলাই ইত্যাদির কাজও করতে পারবেন, ঘরের কাজের জন্য অন্য কাউকে বলতে পারবেন, কিন্তু নিজে উঠে যাবেন না। তবে অন্য কাজে বেশী সময় ব্যয় না করে ইবাদতের প্রতি পূর্ণ মনোযোগী হবেন।

* সুন্নাত ই'তিকাফের মধ্যভাগে মাসিক ঋতুস্রাব শুরু হয়ে গেলে (যদি ইস্তিহাযা না হয়) তবে তাৎক্ষণিকভাবে ই'তিকাফ ছেড়ে দেয়া ওয়াজিব। এমতাবস্থায় যেদিন ঋতুস্রাব শুরু হয়েছে, ওই একদিনের ক্বাযা তার দায়িত্বে ওয়াজিব, পরবর্তী দিনগুলোর নয়। সুতরাং সুন্নাত ই'তিকাফ শুরু করার পূর্বে এটা দেখে নেয়া উচিত হবে যে, ওই দিনগুলোতে মাসিক ঋতুস্রাবের দিনগুলো আসছে কি না। যদি তাই হয় তবে ই'তিকাফ আরম্ভ করবেন না।

* যদি মুসলিম রমণীরা ঘরে (মসজিদে বায়ত) নামাযের জন্য কোন জায়গা নির্দ্ধারিত করে না রাখে, তবে ঘরে ই'তিকাফ করতে পারে না। অবশ্য, যদি তখন, (অর্থাৎ যখন ই'তিকাফের ইচ্ছা করেছে) কোন স্থানকে নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়, তবে ওই জায়গায় ই'তিকাফ করতে পারে। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার)

* অন্য কারো ঘরে গিয়ে মুসলিম রমণী ই'তিকাফ করতে পারে না।

* স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর জন্য ই'তিকাফ করা বৈধ নয়। (দুররে মুখতার)

* যদি স্ত্রী, স্বামীর অনুমতি নিয়ে ই'তিকাফ আরম্ভ করে, পরক্ষণে স্বামী নিষেধ করতে চাচ্ছে। তখন আর নিষেধ করতে পারবে না। যদি তবুও নিষেধ করে, তবে স্ত্রীর জন্য তা পালন করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য নয়। (আলমগীরী)

* ওযূর পানির একটি ফোঁটাও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে মসজিদের ফরশে ফেলা বৈধ নয়। এটা মাকরূহে তাহ্‌রীমী। (আহকামে শরীয়ত)

* মসজিদের বিদ্যুৎ দিয়ে মোবাইল ইত্যাদিতে চার্জ দেন কিংবা রাতভর

মসজিদের লাইট, ফ্যান খোলা রেখে ইবাদত করেন। তবে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সাথে কথা বলে নেবেন। আর সহজ পন্থা হলো– যতটুকু বিদ্যুৎ আপনি ব্যবহার করেছেন সেটার অনুমান করে, তারও অতিরিক্ত কিছু টাকা মসজিদে দিয়ে দেবেন।

ই'তিকাফ ভঙ্গ হলে ক্বাযার মাসাইল

নফল ই'তিকাফের কোন ক্বাযা নেই। মান্নত বা ওয়াজিব ই'তিকাফের বেলায় ভঙ্গ করলে রোযাসহ তার ক্বাযা করবে। সুন্নাতে মু'আক্কাদাহ্ ই'তিকাফ যতদিন ভঙ্গ হয়েছে, ততদিন রমযানের পরে রোযা সহ ক্বাযা করবে। মহিলার হায়য ও নিফাস হয়ে গেলে ওইসব দিনের ক্বাযা রোযাসহ করতে হবে। পুরো দশদিনের ক্বাযা ওয়াজিব নয়। পরবর্তী রমযান শরীফে করে নিলেও আদায় হয়ে যাবে। তবে জীবনের কোন ভরসা নেই, সেহেতু যত শীঘ্রই সম্ভব ক্বাযা আদায় করে নিন। কিন্তু ঈদুল ফিতরের দিন, ঈদুল আযহার দিন ও তার পরবর্তী ৩দিন, এ পাঁচ দিন যেহেতু রোযা রাখা হারাম, সুতরাং এদিনগুলো ব্যতীত বছরের অন্য যে কোন দিন ই'তিকাফের ক্বাযা আদায় করতে পারবেন। (রদ্দুল মুহতার ইত্যাদি থেকে সংকলিত)

* যদি ই'তিকাফ কোন বাধ্যবাধকতার কারণে ভঙ্গ করে থাকে, কিংবা ভুলে ভঙ্গ করে, তাহলে গুনাহ্ নয়। যদি কোন বিশুদ্ধ বাধ্যবাধকতা ব্যতীত জেনে বুঝে ভঙ্গ করে, তাহলে সেটা গুনাহ। সুতরাং ক্বাযার সাথে সাথে তাওবাও করে নেবেন।

* কেউ ই'তিকাফের মান্নাত করার পর মারা যায়, কিংবা মান্নত অথবা সুন্নাতে মু'আক্কাদাহ্ ই'তিকাফ ভঙ্গের ক্বাযা করার অবকাশ পাওয়া সত্ত্বেও ক্বাযা না করে, অথবা আদায় করতে অক্ষম হয়ে যায় আর মৃত্যুর সময় এসে পড়ে, তবে ওয়ারিশদেরকে ওসীয়ত করা ওয়াজিব, যাতে তারা ই'তিকাফের ক্বাযার পরিবর্তে ফিদিয়া আদায় করে। ই'তিকাফের ফিদিয়ার নিয়্যতে ওয়ারিশগণ, কোন যাকাতের উপযোগীকে সাদাক্বায়ে ফিতরের পরিমাণে অর্থাৎ- প্রায় ২ কেজি ৫০ গ্রাম গম বা আটা বা সমপরিমাণ মূল্য প্রদান করবে) একদিনের জন্য এতটুকু আদায় করবে আর যতদিন হয় তার জন্য ততদিনের হিসেবে আদায় করবে। (আলমগীরী ও বাহারে শরীয়ত ইত্যাদি থেকে সংকলিত)

রমযান শরীফে লায়লাতুল ক্বদরের আমল

লায়লাতুল ক্বদর সম্পর্কে আমরা পূর্বে বুযুর্গানে দ্বীন ও সম্মানিত চার ইমাম'র অভিমতগুলো জেনেছি। এখন এ রাতের ফযীলত ও আমল সম্পর্কে জানবো।

এ রাতে ইবাদতকারীকে এক হাজার মাস অর্থাৎ ৮৩ বছর ৪ মাস অপেক্ষাও বেশী ইবাদতের সাওয়াব দান করা হয়।

হযরত সায়্যিদুনা আনাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু বলেন, যখন একবার মাহে

রমযান আসলো তখন রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমাদের নিকট একটি মাস এসেছে, যাতে একটি রাত এমনও রয়েছে, যা হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাত থেকে বঞ্চিত রইলো, সে যেনো সব কিছু থেকে বঞ্চিত রইলো। আর এর কল্যাণ থেকে যে বঞ্চিত থাকে একমাত্র সেই প্রকৃতপক্ষে বঞ্চিত। (ইবনে মাজাহ্ শরীফ, খণ্ড-২)

অবশ্য যারা মদ্যপানে অভ্যস্থ, মাতা-পিতার অবাধ্য, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং যারা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে ও পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করে, তারা ক্ষমা পাওয়া থেকে বঞ্চিত। সুতরাং এ ধরনের গর্হিত কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের এসকল কাজ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে তাওবা করে নেয়া উচিত।

সম্মানিত এ রাতে মাগরিবের নামায জামা'আত সহকারে আদায় করবেন। অতঃপর ৬ রাক'আত সলাতুল আওয়াবীন ২ রাক্'আত করে তিন নিয়্যতে, প্রতি রাক্'আতে সূরা ফাতিহার পর তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করবেন, এভাবে আদায় করবেন। এরপর অন্যান্য নফল ইবাদত করবেন। অতঃপর ইশার নামাযের পূর্বাপর সুন্নাত ও নফল নামায সহ জামা'আত সহকারে আদায় করবেন। অতঃপর তারাভীহ্ নামায আদায় করে বিত্রের আগে কিংবা পরে কমপক্ষে ১২ রাক'আত নফল নামায ৬ রাক'আত আওয়াবীনের নিয়মে ৬ নিয়্যতে আদায় করতে পারেন। অথবা প্রথম রাক'আতে ১বার সূরা ক্বদর, ২য় রাক'আতে ৩বার সূরা ইখলাস) সম্ভব হলে আরো বেশী পরিমাণেও আদায় করতে পারেন। তবে যাদের অতীত জীবনের ক্বাযা নামায অর্থাৎ ওমরী ক্বাযা নিজ জিম্মায় রয়েছে, তারা নফলের স্থলে বেশী পরিমাণে ওমরী ক্বাযার নামায আদায় করবেন। এতে নিজ জিম্মার ফরজ, ওয়াজিব (প্রতিদিনের ২০ রাক'আত) আদায়ের সাথে সাথে নফলের সাওয়াব অর্জন হবে ইনশা-আল্লাহ্।

ক্বাযা নামাযসমূহ নফল নামায থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অথ্যাৎ যে সময় নফল পড়বেন ওই সময় নফল না পড়ে তার পরিবর্তে ক্বাযা নামায গুলো আদায় করে নিবেন, যাতে আপনি দায়মুক্ত হতে পারেন। অবশ্যই তারাভীহ্ এবং (প্রতিদিনের বার রাক'আত সুন্নাতে মুআক্কাদা) (জুমু'আহ্'র ১০ রাক'আত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্) নামায ত্যাগ করবেন না। (রদ্দে মুহতার, খন্ড-১, বাহারে শরীয়ত, খন্ড-৪)

এছাড়া সলাতুত্ তাসবীহ্ ও সলাতুত্ তাহাজ্জুদও আদায় করবেন। এ রাত তাওবা, যিক্র, ক্বোরআন তিলাওয়াত, দুরূদ-সালাম, মীলাদ শরীফ, ঈমানী ও দ্বীনি বয়ান শ্রবণ ইত্যাদি ইবাদতের মাধ্যমে কাটানো উচিত।

হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল হক্বক্বী রহমাতুল্লাহি তা'আলা 'আলায়হ্ একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, যে ব্যক্তি শবে ক্বদরে নিয়্যতের নিষ্ঠাসহকারে (অর্থাৎ- আন্তরিকভাবে একমাত্র আল্লাহ্'র সন্তুষ্টির জন্য) নফল (নামায) পড়বে, তার

পূর্বাপর গুনাহ্ ক্ষমা হয়ে যাবে। (তাফসীরে রূহুল বয়ান, খণ্ড-১০)
তিনি আরো উদ্ধৃত করেছেন, বুযুর্গানে দ্বীন রহিমাহুমুল্লাহ্ (রমযানের) এ (শেষ) দশদিনের প্রতিটি রাতে দু'রাক'আত নফল নামায শবে ক্বদরের নিয়্যতে পড়তেন। তাছাড়া কিছু সংখ্যক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি থেকে উদ্ধৃত, যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাতে দশটি আয়াত এ নিয়্যতে পড়ে নেবে, সে সেটার বারাকাত বা কল্যাণসমূহ ও সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে না।
ফক্বীহ আবুল লায়স সমরকন্দী রহমাতুল্লাহি তা'আলা 'আলায়হ্ বলেন, শবে ক্বদরের নামায কমপক্ষে দু'রাক'আত, বেশীর চেয়ে বেশী একহাজার রাক'আত। মাঝারী পর্যায়ের হচ্ছে– দু'শ রাক্'আত। (তাফসীরে রূহুল বয়ান হতে সংকলিত)
শবে ক্বদরের সারারাত কিংবা সারা বছর দিন-রাতের নফলগুলো প্রতি রাক্'আতে সূরা ফাতিহার পর ৩বার সূরা ইখলাস সহকারে পড়া যায়। এতে প্রতি রাক'আতে এক খতম ক্বোরআন তিলাওয়াতের সাওয়াব অর্জিত হবে (ফাতাওয়ায়ে রযাভীয়্যাহ্, খণ্ড-৭)। এ রাতে দু'রাক'আত নফল নামায প্রতি রাক্'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ক্বদর ১ বার এবং সূরা ইখলাস ৩ বার পড়বেন, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে শবে ক্বদরের সাওয়াব দান করবেন। এবং তাকে জান্নাতে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত (দীর্ঘ) একটি শহর দান করবেন। (ফাযায়িলুশশুহূর)

শবে ক্বদরের দো'আ

হযরত 'আয়িশাহ্ সিদ্দীক্বাহ রদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম -এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি আমি শবে ক্বদর সম্পর্কে জানতে পারি, তবে আমি কি পড়বো? তিনি ইরশাদ করলেন, এভাবে দো'আ প্রার্থনা করো ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ .

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুওভুন তহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী।
অর্থঃ হে আল্লাহ্! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল। তুমি ক্ষমা পছন্দ করো। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করো। (তিরমিযী শরীফ, খণ্ড-৫)

সূরা ক্বদ্র পাঠের কতিপয় ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা 'আলী মুরতাদ্বা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ বলেন, যে কেউ শবে ক্বদরে সূরা ক্বদর সাত বার পড়বে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে প্রত্যেক বালা-মুসীবত থেকে নিরাপত্তা দান করেন। আর সত্তর হাজার ফিরিশতা তার জন্য জান্নাত প্রাপ্তির দো'আ করেন। যে ব্যক্তি (সারা বছরে যখনই) জুমু'আহ্'র নামাযের পূর্বে তিন বার (সূরা ক্বদর) পড়ে, আল্লাহ্ ওই দিনে সমস্ত নামায সম্পন্নকারীর সংখ্যার সমান নেকি লিপিবদ্ধ করেন। (নুযহাতুল মাজালিস)

হাদীস শরীফে রয়েছে, যে (ব্যক্তি) ওযূর পর একবার সূরা ক্বদর পাঠ করবে, তবে সে সিদ্দীক্বীনের মধ্যে গণ্য হবে। আর যে দু'বার পাঠ করবে, তাকে শহীদ গণের মধ্যে গণ্য করা হবে এবং যে তিনবার পাঠ করবে, তাকে আল্লাহ তা'আলা হাশরের ময়দানে আপন নবীগণের সাথে রাখবেন। (কানযুল উম্মাল, খণ্ড-৯)।

শবে ক্বদর অর্জনের দো'আ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল হালীমুল কারীমু সুবহা-নাল্লা-হি রব্বিস্ সামা - ওয়াতিস্ সাব'ই ওয়া রব্বিল 'আরশিল 'আযীম।
অনুবাদঃ সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও 'আরশে 'আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।
ফযীলতঃ যে ব্যক্তি রাতে এ দো'আ তিনবার পড়ে নেবে সে যেন শবে ক্বদ্র পেয়ে গেছে। (গরাইবুল ক্বোরআন, পৃষ্ঠা-৮১৫, তারিখে ইবনে আসাকীর)

রমযান শরীফের রোযার ফযীলত

একজন ঈমানদারের উপর ঈমানের পর যেভাবে নামায ফরয করা হয়েছে, অনুরূপভাবে রমযান শরীফের রোযাও প্রত্যেক মুসলমান বিবেক সম্পন্ন ও বালিগের উপর ফরয। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, খণ্ড-৩)
রোযা পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যেও ছিলো। এমনকি মানবগড়া ধর্মগুলোতেও ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে উপবাস থাকার নিয়ম-রীতি চালু রয়েছে। তবে আমাদের রোযার ধরন তাদের চেয়ে ভিন্ন।
সম্মানিত ফক্বীহগণ বলেন, সন্তানের বয়স যখন ১০ বছর হয়ে যায় এবং তার মধ্যে রোযা রাখার শক্তি হয়, তখন তার দ্বারা রমযান শরীফের রোযা পালন করানো হবে। যদি পূর্ণ শক্তি হওয়া সত্ত্বেও রোযা না রাখে, তবে (হালকা) মারধর করে রাখাবেন। যদি রেখে ভেঙ্গে ফেলে, তবে ক্বাযার নির্দেশ দেবেন না; কিন্তু নামায শুরু করে ভেঙ্গে ফেললে পুনরায় পড়ার নির্দেশ দেবেন।
রোযা আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু'র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে। কারণ, রোযার মাধ্যম পরহিযগারী লাভ হয়। গুনাহ নাফসকে 'আম্মারাহ' করে দেয়। আর 'রোযার কারণে নাফ্স দুর্বল হয়ে পড়ে। (তাফসীরে নূরুল ইরফান) আর পরহিযগার বান্দা আল্লাহ্র প্রিয়। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ .

কানযুল ঈমান শরীফের অনুবাদ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয

করা হয়েছে যেমন (তোমাদের) পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিলো, যাতে তোমাদের পরহেযগারী অর্জিত হয়। (সূরা বাক্বারা, আয়াত-১৮৩)

রোযা ফরয হওয়ার অন্যতম কারণ যাতে পরহেযগারী অর্জিত হয়। পরহেযগার বা খোদাভীরুতা অর্জন করায় একজন মু'মিনের জীবনের মূল লক্ষ্য। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ

কানযুল ঈমান শরীফের অনুবাদ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ খোদাভীরুদেরকে ভালোবাসেন। (সূরা তাওবা, আয়াত-৪)

আরো ইরশাদ করেন- إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ

কানযুল ঈমান শরীফের অনুবাদ ঃ নিশ্চয় ভীতিসম্পন্নদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট শান্তির বাগান সমূহ রয়েছে। (সূরা ক্বালাম, আয়াত-৩৪)

আরো ইরশাদ করেন- إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا

কানযুল ঈমান শরীফের অনুবাদ ঃ নিশ্চয় খোদাভীরুদের জন্য সাফল্যের স্থান রয়েছে; (সূরা নাবা, আয়াত ৩১)

পরহেযগারী বা তাক্বওয়া এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। যথা- নিজেকে ভীতিপ্রদ বস্তু থেকে রক্ষা করা। শরীয়তের পরিভাষায়, নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ পরিহার করে নিজেকে গুনাহ্ থেকে মুক্ত রাখা। হযরত সায়্যিদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুমা বর্ণনা করেছেন, মুত্তাক্বি সেই ব্যক্তিই, যে শিরক, গুনাহে কবীরা ও ফাহিশা (অশ্লীলতা) থেকে বিরত থাকে। কেউ কেউ বলেছেনন, যে ব্যক্তি নিজেকে অন্য কারো থেকে উত্তম মনে করে না সেই হল মুত্তাক্বী। কারো কারো মতে, হারাম বস্তু সমূহ বর্জন করা এবং একান্ত করণীয় কার্যাদি সম্পন্ন করা। কোন কোন মুফাস্সিরের মতে, পুনঃ পুনঃ পাপাচার ও ইবাদত-বন্দেগীর অহংকার বর্জন করায় তাক্বওয়া। কেউ কেউ বলেছেন, এটাই তাক্বওয়া যে, তোমার রব তোমাকে সে স্থানে পাবেন না, যে স্থানটা তোমার জন্য তিনি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। অন্য এক অভিমত হচ্ছে তাক্বওয়া হুযূর সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুম এর অনুসরণেই নাম- (খাযিন)। এ সমস্ত অর্থই পরস্পর সামঞ্জস্য রাখে এবং পরিণাম ও তাৎপর্যের পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পর বিরোধী নয়। (খাযাইনুল ইরফান) আ'লা হযরত রহমাতুল্লাহি তা'আলা 'আলায়হ্ উল্লেখ করেছেন, তাক্বওয়া সাত প্রকার। যথা- ১) কুফর থেকে বিরত থাকা। এটা আল্লাহর অনুগ্রহক্রমে, প্রত্যেক মুসলমানের মধ্যেই রয়েছে; ২) ভ্রান্ত আক্বাইদ

মতবাদ থেকে বেঁচে থাকা। এটা প্রত্যেক সুন্নীর মধ্যেই অর্জিত রয়েছে; ৩) প্রত্যেক কবিরা গুনাহ থেকে বিরত থাকা; ৪) সগীরা বা ছোট-খাটো গুনাহ থেকে বিরত থাকা; ৫) সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকেও দূরে থাকা; ৬) রিপুর প্রবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকা; এবং ৭) অন্যর প্রতি দৃষ্টিপাত না করা। এটা বিশেষ ব্যক্তিবর্গের পর্যায়। রমযানের রোযার মাধ্যমে এসব অর্জিত হয়। (খাযাইনুল ইরফান)

ইসলামে সর্বপ্রথম শুধু আশূরার রোযা ফরয ছিলো। অর্থাৎ বছরে একটা। তারপর প্রতি মাসে তিনটা রোযা ফরয হলো– প্রতি চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে। তারপর রমযান মাসের রোযা এ আয়াত দ্বারা ফরয হয়েছে। আর অন্য রোযাগুলোর 'ফরয হওয়া' রহিত হয়ে গেছে। এ আয়াত ওই রোযাগুলোর জন্য রহিতকারী। বুঝা গেলো যে, হাদীস শরীফ ক্বোরআন শরীফ দ্বারা রহিত হয়, দেখুন! প্রাথমিক যুগের রোযাগুলো 'ফরয হওয়া' হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। ওই গুলোর জন্য কোন আয়াত আসেনি। ওইগুলোর 'ফরয হওয়া' ক্বোরআন 'রহিতকারী' হবার ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়। রোযা হিজরতের পর ২য় হিজরী সনে ফরয হয়েছে। (তাফসীরে নূরুল ইরফান)

হযরত সায়্যিদুনা আবূ সা'ঈদ খুদরী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ থেকে বর্ণিত, রসূলে কারীম সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রেখেছে, সেটার সীমারেখা চিনেছে এবং যা থেকে বেঁচে থাকা চাই, তা থেকে বিরত রয়েছে, (এগুলো) সে যেসব গুনাহ ইতোপূর্বে করেছে, সেগুলোর কাফ্ফারা হবে। (সহীহে ইবনে হিব্বান, খণ্ড-৫)

হযরত সায়্যিদুনা আবূ হোরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ্ থেকে বর্ণিত, সুলতানে দু'জাহাঁ সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মানুষের প্রতিটি সৎকর্মের বিনিময় দশগুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত দান করা হয়। আল্লাহ্ কারীম ইরশাদ করেন,. إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ

কিন্তু রোযা এর ব্যতিক্রম; সেটা আমার জন্য। আমিই তার প্রতিদান দেবো। আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, বান্দা তার ইচ্ছা ও আহার শুধু আমারই কারণে ছেড়ে দেয়। রোযাদারের জন্য দু'টি খুশী- একটা ইফত্বারের সময়, অন্যটা আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের সময়। রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্'র নিকট মুশ্ক অপেক্ষাও বেশী উত্তম। (সহীহ্ মুসলিম শরীফ, খণ্ড-১)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكٰوةٌ وَزَكٰوةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ.

অর্থঃ হযরত আবূ হোরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ থেকে বর্ণিত, রসূলে

কারীম সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রতিটি বস্তুর যাকাত রয়েছে। আর দেহের যাকাত হলো রোযা। (ইবনে মাজাহ্ শরীফ)
এ হাদীসে রোযাকে দেহের যাকাতরূপে গণ্য করে মু'মিন নর-নারীদের সুসংবাদ দেয়া হলো যেভাবে যাকাত আদায়ের মাধ্যমে সম্পদ পবিত্র, ধ্বংসের হাত থেকে নিরাপদ এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তেমনি রোযা পালনের মধ্য দিয়ে দেহ পাপ-পঙ্কিলতার কালিমা হতে পবিত্র, স্বাস্থ্যহানিকর রোগ-ব্যাধি হতে মুক্ত এবং আত্মিক শান্তি বৃদ্ধি পায়। (গাউসিয়া তারবিয়াতী নেসাব)

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ مِنْهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُوْنَ.

অর্থঃ হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু হতে বর্ণিত, রসূলে আকরম নূরে মুজাস্সাম সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বেহেশতে আটটি দরজা রয়েছে। তন্মধ্যে একটির নাম হলো- 'রাইয়ান', যা দ্বারা একমাত্র রোযাদারগণ বেহেশতে প্রবেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করবে। (সহীহ বোখারী ও মুসলিম শরীফ)
হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ক্বাতাদাহ্ রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু প্রমূখের হাদীসের ওস্তাদ হযরত সায়্যিদুনা 'আবদুল্লাহ্ ইবনে গালিব হাদ্দানী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু-কে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। দাফনের পর তাঁর ক্বরর শরীফের মাটি থেকে মুশকের খুশবু আসছিলো। কেউ (তাঁকে) স্বপ্নে দেখে বললো, আপনার সাথে কি আচরণ করা হলো? (তিনি) বললেন যে, খুব ভালো আচরণ করা হয়েছে। বললো, আপনাকে কোথায় নেয়া হলো? (তিনি) বললেন, জান্নাতে। বললো, কোন আমলের কারণে? (তিনি) বললেন, ঈমানে কামিল, তাহাজ্জুদ ও গরমের মৌসুমের রোযা গুলোরে কারণে। তারপর বললো, আপনার ক্বরর শরীফ থেকে মুশকে আম্বরের খুশবু কেন প্রবাহিত হচ্ছে? জবাব দিলেন, এটা আমার তিলাওয়াত ও রোযাগুলোর মধ্যে পিপাসার খুশবু। (হিল্ইয়াতুল আউলিয়া, খন্ড-৬)
হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী কারীম, রঊফুর রহীম সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মাহে রমযানের একটা মাত্র রোযাও নীরবতা সহকারে এবং শান্তভাবে রেখেছে, তার জন্য জান্নাতে একটা ঘর লাল পদ্মরাগ-মণি কিংবা সবুজ পান্না দিয়ে তৈরী করা হবে। (মাজমা'উয্ যাওয়াইদ, খণ্ড-৩)
হযরত সায়্যিদুনা 'আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী আওফা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু থেকে বর্ণিত, মাহবূবে রব্বে আকবার সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, রোযাদারের ঘুমানো ইবাদত, তার নীরবতা তাসবীহ

পাঠ করা, তার দো'আ ক্বূল এবং তার আমল মক্বূল। (শু'আবুল ঈমান, খণ্ড-৩)
হযরত সায়্যিদুনা 'আলী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু থেকে বর্ণিত, সায়্যিদুল মুরসালীন সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যাকে রোযা পানাহার থেকে বিরত রেখেছে, যার প্রতি মনের আগ্রহ ছিলো, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতী ফলমূল থেকে আহার করাবেন আর জান্নাতী পানীয় থেকে পান করাবেন। (প্রাগুক্ত)
হযরত সায়্যিদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, হাবীবে কিব্রিয়া সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ক্বিয়ামতের দিন রোযাদারদের জন্য স্বর্ণের একটা দস্তরখানা রাখা হবে, অথচ লোকজন (হিসাব নিকাশের জন্য) অপেক্ষমান থাকবে। (কানযুল উম্মাল, খণ্ড-৮)
রমযান শরীফের আরো অসংখ্য ফযীলত রয়েছে। যেগুলো বর্ণনা করে শেষ করা বান্দার পক্ষে অসম্ভব। হযরত আবূ মাসঊদ গিফারী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি একটি দীর্ঘ হাদীসে রসূল বর্ণনা করেছেন- সেখানে রয়েছে, রসূলে আকরম সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ্র বান্দারা যদি জানতো রমযান কি জিনিষ, তবে আমার উম্মত কামনা করতো যেন পুরো বছরই রমযান হয়ে যায়"। (সহীহ্ ইবনে খুযায়মা)

রোযার মাসাইল

যেসব কারণে ক্বাযা ও কাফ্ফারা উভয়টি ওয়াজিব

* রমযান মাসের ফরয রোযা নিয়্যত করে রাখার পর বিনা প্রয়োজনে ইচ্ছাকরে পানাহার করলে। তবে রমযান ব্যতিত অন্যমাসে মান্নতের রোযা বা নফল রোযা অথবা রমযানের ক্বাযা রোযা রাখার পর ইচ্ছা করে ভঙ্গ করলে তার পরিবর্তে শুধু একটা রোযা পরে ক্বাযা করবে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। তদ্রূপ কোন মুসাফির বা রোগি অথবা নাবালিগ কিংবা মজনূন (পাগল) রমযানের রোযা রাখার পর এবং রোগী সুস্থ হওয়ার পর রমযানের একটি রোযার পরিবর্তে শুধু একটি রোযা ক্বাযা করবে, আর নাবালিগ রমযানের রোযা ভঙ্গ করলে ক্বাযাও ওয়াজিব হবেনা। যেহেতু সে শরীয়তের হুকুম-আহকামের আওতার বাইরে।
* রমযানের রোযা নিয়্যত করে রাখার পর রোযা অবস্থায় ইচ্ছা করে সামনে বা পিছনের রাস্তায় সঙ্গম করলে বা করালে।
* সিঙ্গা দেওয়ার দরুণ কিংবা সুরমা দেওয়ার দরুণ অথবা চতুষ্পদ জন্তুর সাথে যৌন সঙ্গম করার দরুণ বা স্ত্রী কিংবা অন্য রমণীকে স্পর্শ অথবা চুমু দেওয়ার দরুণ রোযা ভঙ্গ হয়েছে ধারণা করে ইচ্ছাকৃত রোযা অবস্থায় পানাহার করলে।

উপরোক্ত কারণে রমযানের একটি রোযার বদলে অন্য সময়ে একটি ক্বাযা রোযা ও কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। (জাওহারাহ ও বাহারে শরীয়ত, ৫ম খণ্ড)

* নারীর নির্দ্ধারিত তারিখে হায়য বা ঋতুস্রাব আসতো। আজ ঋতুস্রাবের দিন ছিলো। সুতরাং স্বেচ্ছায় রোযা ভঙ্গ করে ফেললো; যে কারণে কাযা ও কাফ্ফারা উভয়টি ওয়াজিব। কিন্তু হায়য আসেনি। তাহলে কাফ্ফারা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে। শুধু কাযা করতে হবে
* স্বপ্নদোষ হয়েছে আর জানা ছিলো যে, তার রোযা যায়নি, এতদসত্ত্বেও আহার করে নিয়েছে, তবে কাফ্ফারা অপরিহার্য। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, খণ্ড-৩)
* প্রেমাস্পদের তৃপ্তি কিংবা দ্বীনী কোন সম্মানিত ব্যক্তির তাবার্রুক হিসেবে (তাদের) থুথু গিলে ফেললে কাফ্ফারা অপরিহার্য। (আলমগীরী, খণ্ড-১)
* চাউল, কাঁচা ভুট্টা, মশুর কিংবা মুগ ডাল খেয়ে নিয়েছে। এমতাবস্থায় কাফ্ফারা অপরিহার্য নয়, ক্বাযা ওয়াজিব।
এ বিধান কাঁচা যবেরও। কিন্তু ভুনা হলে কাফ্ফারা অপরিহার্য। (প্রাগুক্ত)

কাফ্ফারার বিবরণ

(ক) একজন গোলাম বা বাঁদী আযাদ করা।
(খ) সম্ভবপর না হলে লাগাতার (মাঝখানে ভঙ্গ করা ছাড়া) রমযানের একটি রোযার বদলে অন্য সময়ে ষাটটি (৬০) রোযা রাখা।
(গ) তাও সম্ভবপর না হলে ৬০ (ষাট) জন মিসকীন ও অভাবীকে পেট ভরে খানা দেওয়া বা সমপরিমাণ খানার মূল্য পরিশোধ করা।
কাফ্ফারার ষাট রোযা একাধারে আদায় করতে হবে। অবশ্য কোন মহিলার কাফ্ফারার একাধারে ষাট রোযা আদায় করাবস্থায় যদি মাসিক হায়য বা ঋতুস্রাব শুরু হয়ে যায়, তবে হায়য থেকে পবিত্র হওয়ার পর কাফ্ফারার বাকী রোযা আদায় করবে। (রদ্দুল মুহতার, বাহারে শরীয়ত ইত্যাদি)

যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় এবং শুধু ক্বাযা ওয়াজিব হয়

নিম্নলিখিত কারণসমূহে যদি কোন রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়, তবে শুধু ক্বাযা অর্থাৎ (একটি রোযার পরিবর্তে একটি রোযা আদায় করা) ওয়াজিব হয়ঃ
*কোন রোযাদার রোযা অবস্থায় ইচ্ছা করে কোন অখাদ্য বস্তু যেমন মাটি, ঘাস তুলা, কাগজ, কাঠ ও পাথর ইত্যাদি ভক্ষণ করলে।
* কুল্লি করার সময় হঠাৎ পানি পেটের ভিতরে প্রবেশ করলে।
* জবরদস্তি বা জানের ভয়ে অথবা অঙ্গহানির হুমকি দেওয়ায় বাধ্য হয়ে পানাহার করলে।
* বাধ্য হয়ে স্ত্রী সহবাস বা যৌন সঙ্গম করলে।
* নিদ্রাবস্থায় রোযাদারকে কেউ কোন খাদ্যবস্তু আহার করালে। (তবে শর্ত হল যে, জাগ্রত হওয়ার পর রোযাদার এ ব্যাপারে ওয়াকিফহাল বা অবহিত হতে হবে।)

* বৃষ্টির পানি অথবা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঘাম বা অশ্রু মুখে পড়ার পর তা গিলে ফেললে।
* কানে তরল পদার্থ অথবা তৈল প্রবেশ করালে।
* পেট ও মাথার ক্ষতস্থানে তরল ঔষধ লাগানোর ফলে তা পেটে বা মস্তিষ্কে পৌছলে।
* অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভরে বমি আসলে অথবা তা পুনঃ গিলে ফেললে।
* রাত মনে করে ভোরে অথবা সোবহে সাদিক্বের সময় সাহরী (পানাহার) অথবা স্ত্রী সহবাস করলে, পরে জানতে পারল যে সাহরী ও স্ত্রী সহবাসের সময় সোবহে সাদিক্ব ছিলো।
* সন্ধ্যা মনে করে সূর্যাস্ত না যেতেই ইফত্বার করলে।
* ভুলক্রমে আহার করার দরুণ রোযা নষ্ট হয়েছে মনে করে পুণঃ আহার করলে।
* নিদ্রাবস্থায় সঙ্গম করলে।
* বেহুশ অবস্থায় কেউ রোযাদারের সাথে সঙ্গম করলে।
* নিয়্যত ও সাহরী ছাড়া রমযান মাসে দিনের বেলায় সোবহে সাদিক্ব হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস না করলেও পরবর্তীতে এক দিনের একটি রোযা ক্বাযা করতে হবে।
* রোযাদার দাঁত হতে জিহ্বা বা হাত দ্বারা চনা পরিমাণ কোন বস্তু বের করে খেয়ে ফেললে, অনুরূপ দাঁত হতে রক্ত বের হয়ে যদি গলার ভিতরে চলে যায় এবং রক্তের স্বাদ ভিতরে অনুভূত হয়। অনুভূত না হলে ক্বাযা ওয়াজিব হবে না।
* অল্প বমি মুখে আসার পর তা ইচ্ছা করে গিলে ফেললে।
* যৌন উত্তেজনার সাথে স্ত্রী বা কোন রমণীকে চুমু দেওয়ার পর অথবা শরীর স্পর্শ করার পর বীর্যপাত হলে।
* নাকে তরল ঔষধ প্রবেশ করালে ও ইচ্ছা করে নশ টানলে।
* রমযান মাসে সকালে রোযার নিয়্যত না করে দ্বি-প্রহরের পর রোযার নিয়্যত করে পানাহার করলে।
* ছোট নাবালিগা মেয়ের সাথে (যে সঙ্গমের উপযোগী নয়) বা মৃত লাশ ও পশুর সাথে সঙ্গম করলে, যদি বীর্যপাত হয়।
* হস্ত মৈথুন করে অথবা স্ত্রীর রান বা পেটে হাত দিয়ে স্বেচ্ছায় বীর্য বের করলে অবশ্য হস্ত মৈথুনের ফলে বীর্য বের না হলে ক্বাযা ওয়াজিব হবে না। (দুররুল মুখতার ইত্যাদি) হাদীস শরীফে হস্ত মৈথুন কারীকে মালউন (অভিশপ্ত) আখ্যায়িত করা হয়েছে। (আমালি ইবনে বুশরান, খন্ড-২) আ'লা হযরত রহমাতুল্লাহি তা'আলা 'আলায়হ্ বলেন, সে গুনাহগার ও অপরাধী। একাজ বারবার করার কারণে সে কবীরা গুনাহ্কারী এবং ফাসিক্ব সাব্যস্থ হবে। হাশরের ময়দানে হস্ত মৈথুনকারীরা

গর্ভিত হাত নিয়ে উঠবে। ফলে বিশাল জনসমুদ্রে তাদের অপদস্থ হতে হবে। যদি তারা এ কাজ থেকে তাওবা না করে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা শাস্তিও দিতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমাও করে দিতে পারেন। এ অভ্যাস থেকে মুক্তির জন্য হস্ত মৈথুনকারীদের সর্বদা লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ্ পাঠ করা উচিত। যখন শয়তান তাদের এ খারাপ কাজের জন্য প্ররোচিত করবে, তখন সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ধ্যানমগ্ন হয়ে অধিকহারে লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ্ পাঠ করবে। সর্বদা পাঁচ ওয়াক্তত নামায যথা সময়ে আদায় করবে। ফজরের নামাযের পর নিয়মিত সূরা ইখলাস (দশ বার) পাঠ করবে। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল অধিক জ্ঞাত। (ফাতাওয়ায়ে রযাভিয়্যাহ্, খন্ড-২২)

* সুস্থাবস্থায় নিয়্যত সহকারে রোযা শুরু করার পর পাগল হয়ে গেলে, পরবর্তীতে জ্ঞান ফিরে আসলে উক্ত দিনের রোযার ক্বাযা করবে।

* নিয়্যত সহকারে রোযা শুরু করার পর রোযাবস্থায় মহিলাদের মাসিক ঋতু (হায়য) ও প্রসবকালীন রক্ত (নিফাস) জারী হলে।

* রমযান মাসে সোবহে সাদিক্বের পূর্বে স্ত্রী সহবাসে রত হলো, সোবহে সাদিক্ব হওয়ার সাথে সাথে পৃথক হয়ে রমযানের রোযা শুরু করে দিলে, উক্ত দিনের রোযার ক্বাযা করা ভাল। কাফ্ফারা নয়।

* রোযাবস্থায় ভুলবশতঃ স্ত্রী সঙ্গমে রত হলে, স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে পৃথক হয়ে গেল, তাহলে ক্ষতি নেই, কিন্তু স্মরণ হওয়ার পরও যদি সহবাস অবস্থায় থেকে যায়, তাহলে উক্ত দিনের ক্বাযা ওয়াজিব; কাফ্ফারা নয়।

* হুক্কা, তামাক, সিগারেট পান করার দরুণ রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় এবং ক্বাযা অপরিহার্য হয়। (আলমগীরী, রদ্দুল মুহতার ও বাহারে শরীয়ত ইত্যাদি)

মাসআলাঃ মুসাফির সফর থেকে রমযান মাসের দিনের বেলায় স্বদেশে ফিরে আসলে, মহিলারা হায়য-নিফাস থেকে রমযানের দিনের বেলায় পবিত্র হলে, মজনূনের (পাগল) জ্ঞান ফিরে আসলে, রোগী রমযানের দিনের বেলায় রোগ হতে মুক্ত হলে, কেউ বাধ্য করে রোযা ভাঙ্গালে, পানি হঠাৎ করে গলার ভিতরে চলে গেলে ভোর (সোবহে সাদিক্ব) হওয়ার পর রাত আছে মনে করে সাহরী গ্রহণ করলে, ইফত্বারের সময় না হওয়া সত্ত্বেও সূর্য অস্ত গেছে মনে করে ইফত্বার করলে, এমতাবস্থায় দিনের বাকী অংশ রোযার মত অতিবাহিত করা ওয়াজিব, পরে ক্বাযাও ওয়াজিব। অবশ্য নাবালিগ অথবা কাফির যদি রমযানের যে কোন দিনে বালিগ অথবা মুসলমান হয় তবে পরবর্তীতে উক্ত দিনের ক্বাযা রোযা তাদের উপর ওয়াজিব নয়। কিন্তু উক্ত দিনের বাকি সময়টুকু রোযাদারের মত অতিবাহিত করা অপরিহার্য। (দুরুল মুখতার ও কানুনে শরীয়ত)

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তির যিম্মায় যদি রোযার ক্বাযা থাকে এবং তিনি সম্পদও রেখে

যান আর রোযার ফিদিয়া আদায় করার জন্য ওলি-ওয়ারীশানকে ওসীয়ত করে যান, তবে অবশ্যই যেন তার পক্ষ হতে প্রতি রোযার বিনিময়ে গরীব-মিসকীনকে ফিদিয়া আদায় করা হয়। রোযার ফিদিয়া হল অর্ধ সা' বা দুই সের তিন ছটাক আধা তোলা= ২ কেজি ৫০ গ্রাম গম বা আটা অথবা সমপরিমাণ মূল্য প্রতিটি রোযার বিনিময়ে প্রদান করবে। হ্যাঁ, যদি তিনি ওসীয়ত নাও করেন যান, কিন্তু সম্পদ রেখে যান তবে ওলী-ওয়ারীশান মৃত ব্যক্তির ক্বাযা নামায ও ক্বাযা রোযার ফিদিয়া আদায় করা খুবই উপকারী ও উত্তম। (বাহারে শরীয়ত: ৫ম খণ্ড)

মাসআলাঃ শিশুর বয়স দশ বছর হওয়ার পর যদি রমযান শরীফের রোযা রাখতে শক্তিমান হয়, তবে যেন তাকে রোযা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়, না রাখলে যেন বাধ্য করা হয়। অবশ্য দশ/এগার বৎসরের অপ্রাপ্ত বয়সের শিশু রমযান শরীফের রোযা রাখার পর ভঙ্গ করলে ক্বাযা আদায়ের নির্দেশ দেওয়া যাবে না। কিন্তু নামাযের বেলায় পুনরায় পড়ার নির্দেশ প্রদান করবে। (রদ্দুল মুহতার ইত্যাদি)

রোযার মাকরূহসমূহ

* গীবত, চুগলী, গালি-গালাজ, বেহুদা কথা-বার্তা বলা, কারো অন্তরে কষ্ট দেওয়া, আল্লাহ্র বান্দাগণের উপর যুল্ম করা, অশ্লীল কথাবার্তা, বেহায়াপনা ও ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলা হারাম ও গুনাহ। রোযা অবস্থায় এ সমস্ত নিষিদ্ধ কাজ করা আরো জঘন্য। সুতরাং এ সবের কারণে রোযা মাকরূহ হয়ে যায়। তবে ক্বাযা ও কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় না, কিন্তু রোযাদার অবশ্যই গুনাহগার হবে এবং রোযার সাওয়াব অনেক কমে যাবে। (বাহারে শরীয়ত: ৫ম খণ্ড ইত্যাদি)

* বিনা প্রয়োজনে রোযাদার কোন খাদ্য জাতীয় বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করা বা কোন শক্ত খাদ্য দ্রব্য যেমন রুটি ইত্যাদি চিবানো মাকরূহ। অবশ্য স্বামী বা মুনিব যদি বদ মেজাজী হয় কিংবা শিশু যদি এত ছোট হয় যে, তাকে দেয়ার মত অন্য কোন নরম খাদ্য না থাকে, এমতাবস্থায় তাকে রুটি চিবিয়ে নরম করে দেওয়া মাকরূহ নয়। অবশ্য স্বাদ গ্রহণের সময় এবং চিবিয়ে নরম করার সময় সতর্ককতা অবলম্বন করতে হবে যেন কণ্ঠনালীর ভিতরে কিছু প্রবেশ না করে, বরং সামান্য মুখে রেখে স্বাদ অনুভব করে বা রুটি চিবানোর সাথে সাথে থুথু ফেলে দেবে এবং চিবানো রুটি বের করে ফেলবে। অসতর্কাবস্থায় রোযা ভেঙ্গে যাওয়ার আশঙ্কা অত্যন্ত বেশী। (দুররে মোখতার ইত্যাদি)

* রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দেওয়া, জড়িয়ে ধরা ও শরীর স্পর্শ করা মাকরূহ, যদি বীর্যপাত হওয়ার বা সহবাসে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা হয়। তবে স্ত্রীর মুখ বা ঠোঁটে চুমু দেওয়া রোযাদারের জন্য যে কোন অবস্থায় মাকরূহ। (কানুনে শরীয়ত ইত্যাদি)

* অধিক রূপচর্চার জন্য সুরমার ব্যবহার এবং দাড়ি এক মুটি পরিমাণ থাকা সত্ত্বেও আরো লম্বা করার জন্য দাঁড়িতে তৈলের ব্যবহার রোযাদারের জন্য

মাকরূহ। (দুররুল মোখতার, ইত্যাদি)

* রোযাদারের জন্য গোসল ও ওযূতে কুল্লি করার সময় ও নাকে পানি দেওয়ার সময় অতিরিক্ত করা মাকরূহ। যেহেতু এমতাবস্থায় ভিতরে পানি প্রবেশের ভয় থাকে। (আলমগীরী ইত্যাদি)

* থুথু মুখে জমিয়ে গিলে ফেলা, রোযাদারের জন্য মাকরূহ।

* পায়খানা ও প্রস্রাবের পর ইস্তিনজা বা পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করার সময় অতিরিক্ত করা রোযাদারের জন্য মাকরূহ। যেহেতু এমতাবস্থায় অতিরিক্ত পানির ব্যবহার করলে সামনে-পেছনের রাস্তা দিয়ে ভিতরে পানি প্রবেশের ভয় থাকে। তবে রোযা ছাড়া অন্য অবস্থায় অপচয় না হলে মাকরূহ নয়।

* পুকুরে গোসল করার সময় পানির ভিতর বায়ু ছাড়া রোযাদারের জন্য মাকরূহ। যেহেতু এতেও পানি প্রবেশের ভয় থাকে।

* সাহরীর জন্য দেরী করা রোযাদারের জন্য মুস্তাহাব, তবে তত বেশী দেরী করা মাকরূহ, যার কারণে সুবহে সাদেক্ব হয়ে যাওয়ার ভয় হয়।

উল্লেখিত ও বর্ণিত বিষয়সমূহ দ্বারা রোযা মাকরূহ হয়ে যায়। তবে ক্বাযা ও কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় না, রোযার নেকী ও সাওয়াব কমে যাবে।

(ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, রদ্দুল মোহতার ও বাহারে শরীয়ত ইত্যাদি)

রোযা অবস্থায় জায়িয কাজসমূহ

রোযা অবস্থায় মিস্ওয়াক করা, দাড়ি, গোঁফ ও চুলে তৈল দেওয়া, গোলাপ, মুশ্ক ও আতরের ঘ্রাণ লওয়া, আতর ও সুরমার ব্যবহার, ওযূ গোসলের সময় স্বাভাবিকভাবে কুল্লি করা ও নাকে পানি দেওয়া, ওযূ-গোসল ছাড়াও ঠান্ডার জন্য নাকে, মুখে ও শরীরে পানি ঢালা জায়েয; বরং মিস্ওয়াক করা, আতর ও সুরমার ব্যবহার যেভাবে রোযা ছাড়াও সুন্নাত, তদ্রূপ রোযা অবস্থায়ও সুন্নাত। ফরয গোসলে যেমনিভাবে কুল্লি করা ও নাকে পানি দেওয়া রোযা ছাড়া ফরয, তেমনিভাবে রোযা অবস্থায়ও ফরয, তবে রোযা অবস্থায় কুল্লি ও নাকে পানি দেওয়ার সময় অতিরিক্ত করবে না এবং রোযা অবস্থায় গরগরাও করবে না। যেহেতু এতে কণ্ঠনালীর ভেতরে পানি প্রবেশ করার আশঙ্কা থাকে। (বাহারে শরীয়ত ইত্যাদি)

যা রোযাকে নষ্ট করে না

* রোযা স্মরণ না থাকা অবস্থায় রোযাদার ভুলবশতঃ দিনের বেলায় পানাহার বা স্ত্রী সঙ্গম করলে রোযা নষ্ট হয় না। তবে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে ওই পানাহার বা স্ত্রী সহবাস পরিহার করতে হবে। রোযার কথা স্মরণের পরেও যদি পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গমে লিপ্ত থাকে, তবে অবশ্যই রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।

* ধোঁয়া, ধুলি-বালি ও মাছি কণ্ঠনালীর ভিতরে ঢুকে গেলে রোযা নষ্ট হয় না,

তবে ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কোন রোযাদার মাছি গিলে ফেলে, অথবা ধোঁয়া বা নশ্ টেনে ভিতরে প্রবেশ করায়, তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

* শিঙ্গা বসালে রোযা নষ্ট হয় না।

* থুথু বা কফ্ গিলে ফেললে রোযা নষ্ট হয় না, তবে সতর্ক থাকা চাই।

* দাঁত হতে রক্ত বের হয়ে যদি ভিতরে চলে যায় এবং রক্তের স্বাদ যদি ভিতরে অনুভব না হয় তবে রোযা নষ্ট হবেনা, আর যদি রক্তের স্বাদ কণ্ঠনালীর ভিতরে অনুভব হয়, তবে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।

* সোবহে সাদিক্বের পূর্ব হতে সাহরী খাওয়া শুরু করেছিল, এদিকে সোবহে সাদিক্ব হয়ে গেল। সোবহে সাদিক্ব হওয়ার সাথে সাথে যদি খানা বা গ্রাস মুখ থেকে ফেলে দেয়, তা'হলে রোযা নষ্ট হবে না, আর যদি সোবহে সাদিক্ব হওয়ার পরেও খানা বা গ্রাস খেয়ে ফেলে তবে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।

* তিল, সরিষা, রায় পরিমাণ কোন খাদ্য বস্তু চর্বন করার পর থুথুর সাথে যদি কণ্ঠনালীর ভিতরে চলে যায়, তবে রোযা নষ্ট হবে না। হ্যাঁ, যদি এর স্বাদ কণ্ঠনালীতে অনুভূত হয় তবে রোযা নষ্ট হবে।

* গোসল বা মাথায় পানি ঢালার সময় যদি পানি কানে প্রবেশ করে, এতে রোযা নষ্ট হয় না।

* স্বপ্নদোষ হলে রোযা নষ্ট হয় না।

* অপবিত্রাবস্থায় ভোর করলে বা সারাদিন গোসল না করে নাপাক থাকলে রোযা নষ্ট হয় না, তবে এভাবে ইচ্ছা করে দীর্ঘক্ষণ গোসল না করা গুনাহ ও হারাম।

* মহিলার সামনের ও পিছনের রাস্তা ছাড়া অন্য স্থানে সঙ্গম করলে বা হস্ত মৈথুন করলে যদি বীর্য বের না হয় তবে রোযা নষ্ট হবে না। তবে এ ধরনের কাজ জঘন্যতম হারাম ও গুনাহ। অবশ্য এ ধরনের কাজে যদি বীর্য বের হয়ে যায় তবে রোযা নষ্ট হয়ে যায়।

* কোন রমণীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে বা কোন মহিলার লজ্জাস্থানের দিকে নজর করলে অথবা সঙ্গমের খেয়াল করার কারণে যদি বীর্যপাতও হয়ে যায় তবে রোযা নষ্ট হবে না। অবশ্য, এ সমস্ত কাজ অত্যন্ত বর্জনীয় ও নিন্দনীয়।

* চতুষ্পদ জন্তু ও মৃত রমণীর সাথে সঙ্গম করলে যদি বীর্যপাত না হয় তবে রোযা নষ্ট হবে না। বীর্যপাত হলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। তবে এ জাতীয় কাজ হারাম ও গুনাহ।

* জিন্-পরীর সাথে সঙ্গম করলে যদি বীর্যপাত না হয় তবে রোযা নষ্ট হবে না,

বীর্যপাত হলে রোযা নষ্ট হয়ে যায়। হ্যাঁ যদি জিন-পরী মানুষের আকৃতি ধারণ করে, তবে সঙ্গমের সময় বীর্যপাত না হলেও রোযা নষ্ট হয়ে যাবে এবং ক্বাযা ও কাফ্ফারা উভয়টা ওয়াজিব হবে। (আলমগীরী, রদ্দুল মুহতার, বাহারে শরীয়ত ও কানুনে শরীয়ত ইত্যাদি)

রোযাবস্থায় ইনজেকশন ও স্যালাইনের বিধান

এ কথা চির সত্য যে, মুখ, কান ও নাক দিয়ে তরল ঔষধ পেটে বা মস্তিষ্কে প্রবেশ করালে অথবা পেট ও মাথার ক্ষতস্থানে তরল ঔষধ লাগানোর ফলে তা পেটে বা মস্তিষ্কে পৌঁছলে রোযা নষ্ট হয়ে যায়, যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং যদি কোন খাদ্য জাতীয় তরল বস্তু বা তরল ঔষধ ইনজেকশন ও স্যালাইনের মাধ্যমে পেটে ও মস্তিষ্কে পৌঁছানো হয়, তবে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে, পরে তা ক্বাযা করতে হবে। কিন্তু যে সমস্ত ইনজেকশন হাত-পায়ের রগ বা শরীরের মাংসে পুশ্ (ব্যবহার) করে রগে বা মাংসে ঔষধ ঢুকানো হয়, যা অধিকাংশ হাকিম ও পারদর্শী ডাক্তারের অভিমতানুযায়ী সরাসরি পেটে বা মস্তিষ্কে পৌঁছে না; বরং তা শরীরের রক্তে মিশে যায়, এ ধরনের ইনজেকশনের কারণে অধিকাংশ বিজ্ঞ গবেষক ওলামা-ই কেরামের মতে রোযা নষ্ট হবে না। যেহেতু তরল ঔষধ ব্যবহারে রোযা নষ্ট হবে তখনই, যখন উক্ত ঔষধ পেট বা মস্তিষ্কে পৌঁছে যায়। নতুবা রোযা নষ্ট হবে না, যেমন শরীরের যে কোন ক্ষতস্থানে তরল ঔষধ লাগালে রোযা নষ্ট হবে না, যদি তা পেট বা মস্তিষ্কে না পৌঁছে, এমনকি অধিকাংশ ওলামা-ই কেরাম বিশেষতঃ ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফা রহমাতুল্লাহি তা'আলা 'আলায়হি ও ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র মতে পুরুষের প্রস্রাবের রাস্তায় তরল ঔষধ, পানি বা তৈল প্রবেশ করালে রোযা নষ্ট হবে না; যেহেতু পুরুষের পেশাবের রাস্তায় তৈল বা পানি বা তরল ঔষধ দিলে তা অভিজ্ঞ ডাক্তার ও হাকিমগণের মতে পেট বা মস্তিষ্কে পৌঁছে না, তবে মহিলার লজ্জাস্থান বা প্রস্রাবের ছিদ্রে তৈল বা পানি বা তরল ঔষধ প্রবেশ করালে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ তখন তা পেটে পৌঁছে যায়। (জরুরী মাসাইল, কৃতঃ মুফতী জালাল উদ্দিন আহমদ আমজাদী) * কৃত্রিম ঔষধ সেবনের মাধ্যমে যদি ঋতুস্রাব বন্ধ রাখা হয়, আর স্রাব না হওয়াতে তা পবিত্রতা সময় হিসেবে ধরা হবে। ঐ সময় নামায, রোযা পালন করলে তা আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু এভাবে ঔষধের মাধ্যমে ঋতুস্রাব বন্ধ রাখা অনুচিত, স্বীয় শরীরের উপর জুলুমের শামিল। এতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে; তদুপরি এটা আল্লাহ্ প্রদত্ত স্বাভাবিক নিয়মের উপর হস্তক্ষেপের নামান্তর। যেহেতু ঋতুস্রাবকালে আল্লাহ নারীদের জন্য শরীয়তের বিধান পালনে সহজ করে দিয়েছেন, সেহেতু নামায-রোযা পালনে অতি উৎসাহি হয়ে তা বন্ধ করা অনুচিত। (যুগ জিজ্ঞাসা)

কি কি কারণে রোযা না রাখার অনুমতি আছে বা রোযা ভঙ্গ করতে পারে

* মহিলাদের গর্ভাবস্থায়, * স্তন্য দান, * সফর, * অসুস্থতা, * বার্ধক্য, * জীবন নাশের আশঙ্কা, * মস্তিষ্ক বিকৃতি ও * জিহাদ-এর কারণে রমযানের রোযা না রাখার অনুমতি আছে এবং এসব কারণ দূরীভূত হওয়ার পর বাদ পড়া রোযাসমূহের প্রতিটি রোযার বদলে একটি করে ক্বাযা আদায় করতে হবে।

মাসআলাঃ গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী মহিলা রোযা রাখলে নিজের জীবনের বা গর্ভের শিশুর অথবা দুগ্ধপায়ী শিশুর জীবন নাশের আশঙ্কা হয়, তাহলে রোযা না রাখার অনুমতি আছে বা রোযা ভঙ্গ করতে পারে। স্তন্যদাত্রী শিশুর মা ও ধাত্রী একই বিধানের আওতাভুক্ত। তদ্রূপ অসুস্থতার দরুন রোযা না রাখার অনুমতি আছে তখনই, যখন রোগ বৃদ্ধির বা বিলম্বে আরোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সুস্থ ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হওয়ার নিছক খেয়াল অথবা বাহানা করে রোযা ছেড়ে দেয়ার অনুমতি নেই। দৃঢ় ধারণা ও পূর্ণ বিশ্বাসের তিনটি ধরন বা লক্ষণ আছেঃ এক. রোগ বৃদ্ধির বা জীবন নাশের বাহ্যিক লক্ষণ পাওয়া গেলে, দুই. নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং তিন. এমন অভিজ্ঞ ও পারদর্শী মুসলিম ডাক্তারের পরামর্শ, যে ফাসিক্ব নয়। উক্ত বিষয়সমূহের কোন একটি পাওয়া না গেলে বরং নিছক খেয়াল ও কল্পনার ভিত্তিতে বা ফাসিক্ব কোন একটি পাওয়া না গেলে বরং নিছক খেয়াল ও কল্পনার ভিত্তিতে বা ফাসিক্ব ডাক্তারের পরামর্শক্রমে রমযানের রোযা ভঙ্গ করলে ক্বাযা ও কাফ্ফারা উভয়টা আবশ্যক হবে। (রদ্দুল মুহতার ইত্যাদি)

উল্লেখ্য যে, কোন অনভিজ্ঞ চিকিৎসক সামান্য সর্দির মত রোগের কারণেও রোযা ভঙ্গের নির্দেশ ও পরামর্শ দিলে, তার পরামর্শক্রমে রোযা ভঙ্গ করা যাবে না।

মাসআলাঃ যে সফররত অবস্থায় রোযা না রাখার অনুমতি আছে, তা দ্বারা শর'ঈ সফর বুঝানো হয়েছে। সাধারণ বা মা'মুলী ৮/১০ মাইলের সফরের কারণে রোযা ভঙ্গ করার অনুমতি নেই। শর'ঈ সফর বলতে তিন মঞ্জিল বা ৫৭ মাইল (প্রায় ৯২ কিঃ মিঃ) বা আরো অধিক পথ পায়ে হেঁটে বা যে কোন যান্ত্রিক উপায়ে অতিক্রম করা এবং ১৫ (পনর) দিনের ভিতরে স্বীয় অবস্থানে ফিরে আসার কিংবা অন্যত্র সফর করার নিয়্যত করা। তবে মুসাফিরের যদি সফরের সময়ে কোন ক্ষতি না হয় তবে সফরে রমযানের রোযা রাখা উত্তম ও অনেক সাওয়াবদায়ক। অবশ্য কোন মুসাফির যদি শর'ঈ অর্ধদিবসের বা সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে যাওয়ার আগে রমযান মাসে নিজ গৃহে বা স্বীয় অবস্থানে ফিরে আসে, কিন্তু তখনো সে কিছু আহার করে নি, তাহলে ওই দিনের রোযার নিয়্যত করে রোযা পূর্ণ করা তার উপর ওয়াজিব। (কানুনে শরীয়ত ইত্যাদি)

মাসআলাঃ অধিক ক্ষুধা ও তৃষ্ণার দরুণ যদি প্রাণহানির বা মস্তিষ্ক বিকৃতির

নিশ্চিত আশঙ্কা হয় অথবা সর্প দংশনের ফলে প্রাণহানির দৃঢ় আশঙ্কা হয়, তবে রোযা ভেঙ্গে ফেলবে। পরে ক্বাযা করবে। (রদ্দুল মুহতার, বাহারে শরীয়ত ইত্যাদি)

মাসআলাঃ অতিশয় বৃদ্ধ লোক, যে বয়স বৃদ্ধির কারণে এমন দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, রোযা রাখতে পারছে না, ভবিষ্যতেও রাখার আশা করতে পারে না, তবে তার জন্য রোযা না রাখার অনুমতি আছে। অবশ্য সে রমযানের প্রতিটি রোযার পরিবর্তে ফিদিয়া স্বরূপ একজনের ফিত্‌রা বরাবর দুই সের তিন ছটাক আধা তোলা=দুই কেজি পঞ্চাশ গ্রাম গম বা আটা অথবা সমপরিমাণ মূল্য একজন মিসকীনকে প্রদান করবে। হ্যাঁ, রোযার ফিদিয়া আদায় করার পর যদি পরবর্তীতে রোযা রাখার শক্তি এসে যায়, তবে রমযানের প্রতিটি রোযার বদলে একটি করে রোযার ক্বাযা করবে। তখন ফিদিয়া নফল সাদক্বাহ্ হিসেবে গণ্য হবে। (হিদায়া ও আলমগীরী ইত্যাদি)

অবশ্য যদি কেউ উক্ত নিষিদ্ধ দিনসমূহে রোযা রাখার মান্নত করে, তবে উক্ত দিনসমূহের পরে মান্নতের রোযা পূর্ণ করবে। (বাহারে শরীয়ত ও কিতাবুল আশ্‌বাহ ইত্যাদি)

* হুঁশ জ্ঞানের মধ্যে যদি সত্যই ত্রুটি ও ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবে রোযা ভঙ্গ করার অনুমতি আছেঃ কিন্তু পরবর্তীতে ক্বাযা করবে। (বাহারে শরীয়ত)

* রোযা ভঙ্গ করার জন্য যদি স্বামী বা অন্য কেউ বাধ্য করে, এমনকি ভঙ্গ না করলে প্রাণহানি বা অঙ্গহানির ভয় হয়, তবে যে কোন রোযা এমনকি রমযানের রোযা পর্যন্ত ভঙ্গ করার অনুমতি আছে। পরে অবশ্যই ক্বাযা করবে। (দুররে মুখতার ইত্যাদি)

* যদি কোন ব্যক্তি শপথ করে বলে যে, যদি তুমি রোযা ভঙ্গ না করো, তবে আমার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে, তবে রোযা ভঙ্গ করার অনুমতি আছে। অবশ্য পরে ক্বাযা করবে। (দুররে মুখতার ইত্যাদি)

রোযার বিবিধ মাসআলা

* যদি প্রচন্ড রোদ্রে কাজ করাতে রোযা রাখা সম্ভব হয় এবং ঐ ব্যক্তি মুকিম (স্থায়ী বাসিন্দা) হয়, মুসাফির না হয়, তবে তার উপর রোযা রাখা ফরয। আর যদি এমন প্রচন্ড গরমে কাজ করে রোযা রাখা সম্ভব না হয় এবং রোযা রাখার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তবে মুকিম ব্যক্তি এমন সূর্যের তাপে প্রচন্ড গরমে কাজ করা হারাম। (অন্য কাজ করবে) (ফাতাওয়ায়ে রযাভিয়্যাহ্, খন্ড-২০) * জামা'আতের জন্য বিশেষ প্রয়োজনে লাউড স্পিকার ব্যবহার করাতে কোন অসুবিধা নেই। তবে লাউড স্পিকারের সাথে সাথে মুসল্লীদের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তি মুকাব্বীর হবেন। কারণ, বড় জামা'আতে মুকাব্বীর নিযুক্ত করা সুন্নাত। লাউড স্পিকারের কারণে যাতে সুন্নাতের উপর আমল বাদ পড়ে না যায় সেদিকে অবশ্যই সুদৃষ্টি রাখবে। তবে যদি ছোট জামা'আতে শেষ কাতার পর্যন্ত ইমামের আওয়াজ সহজে পৌঁছে, এমন ছোট জামা'আতে লাউড স্পিকার ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। বরং

ছোট জামা'আতে বিনা প্রয়োজনে মাইক বা লাউড স্পিকার ব্যবহার করা অনর্থক ও অনুচিত। এটাই বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ ইসলামী স্কলার ও ফিক্বহ্‌বিদগণের চূড়ান্ত অভিমত। উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ মনিষীগণের অভিমতকে তোয়াক্কা না করে বড় জামা'আতে বিশেষ প্রয়োজনে লাউড স্পিকারের ব্যবহারকে কুফরী ও বেঈমানী বলে বই-পুস্তক লেখা বা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদান করা গোড়ামী, পাগলামী ও মূর্খতার নামান্তর। (যুগ জিজ্ঞাসা-কৃত আল্লামা মুফ্‌তি সৈয়্যদ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান আল ক্বাদেরী)

* বাতিল আক্বিদা সম্পন্ন ইমামের পিছনে জেনে শুনে নামায পড়লে গুনাহগার হবে। পড়লে পরবর্তীতে ঐ নামায পুনরায় অবশ্যই আদায় করে দিতে হবে। ফতহুল ক্বদীর শরহে হিদায়া কিতাবে ইমাম কামাল উদ্দীন ইবনে হুম্মাম হানাফী রহমাতুল্লাহি তা'আলা 'আলায়হ্, ইমাম আ'যম আবূ হানিফা, ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানী রহমাতুল্লাহি তা'আলা 'আলায়হিম এ তিনজন মহান ইমামের বরাতে উল্লেখ করেছেন, বদ্-দ্বীন তথা বদ মাযহাবীর পেছনে নামায বৈধ নয়। আ'লা হযরত ইমাম শাহ্ আহমদ রযা খান রহমাতুল্লাহি তা'আলা 'আলায়হ্ ফাতাওয়ায়ে রযাভিয়্যাহ্'র ৩য় খন্ডে উল্লেখ করেছেন, "ওহাবী তথা বাতিল আক্বীদা সম্পন্ন ইমামের পেছনে নামায বাতিল। ওই নামায মোটেই আদায় হবেনা"। অতএব সুন্নী ইমাম পাওয়া গেলে নামায একাকী পড়বে। কোন ওহাবী, মওদূদী, খারেজী, শিয়া আক্বিদা সম্পন্ন ইমামের পিছনে নামায পড়া থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে। না জেনে কোন বাতিল ইমামের পিছনে নামায আদায় করার পর পরবর্তীতে তার বদ আক্বীদা সম্পর্কে জ্ঞাত হলে অবশ্যই উক্ত নামায পুনরায় পড়ে নিবে।(যুগ জিজ্ঞাসা)

* মসজিদে ই'তিকাফকারী ছাড়া অন্য কারো জন্য পানাহার করা জায়িয নেই। তাই নফল ই'তিকাফের নিয়্যত করেই মসজিদে আয়োজিত ইফত্বার মাহফিলে রোযাদারগণ ইফত্বার করবে। তবে মসজিদের যেন বেহুরমতি না হয় এবং অপরিষ্কার না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।(যুগ জিজ্ঞাসা)

হিজড়াদের হুকুম

জন্মগত ভাবে যার স্ত্রীলিঙ্গ ও পুরুষলিঙ্গ উভয় রয়েছে তাকে আরবীতে 'খুনসা', বাংলায় 'হিজড়া' বলে। কোন হিজড়ার যদি পুরুষাঙ্গ দিয়ে প্রস্রাব হয়, দাঁড়ি-গোঁফ গজায় বা স্বপ্নদোষ হয় তবে সে পুরুষের অন্তর্ভুক্ত। আর যে হিজড়ার স্ত্রীলিঙ্গ দিয়ে প্রস্রাব হয় বা ঋতুস্রাব ও স্তন স্ফীত হলে তাকে নারী হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। আর তদনুযায়ী নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি পালন করবে এবং মীরাসও বন্টন হবে। কিন্তু হিজড়া পুরুষ কি নারী তা নির্ণয় করা যদি অসম্ভব হয় তাকে আরবীতে 'খুনসা-ই মুশকিল' বলা হয়। এমতাবস্থায়

উত্তরাধিকার স্বত্ত্ব(মীরাস) বন্টনের ক্ষেত্রে তাকে নারী বা পুরুষ যা বিবেচনা করলে সে অপেক্ষাকৃত কম অংশ পাবে তাকে তাই দিবে এবং সে তদনুযায়ী ওয়ারিশী স্বত্ত্ব লাভ করবে।(হেদায়া, কুদূরী, সিরাজী ইত্যাদি)

রমযান শরীফের রোযা না রাখার ক্ষতি

যেমনিভাবে রোযার অগণিত ফযীলত রয়েছে, তেমনিভাবে শরয়ী' কারণ ব্যতীত রোযা ত্যাগ করলে সীমাহীন শাস্তির কথা বর্ণিত রয়েছে। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা আবূ হোরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি রমযানের একদিনের রোযা শরীয়তের অনুমতি ও রোগাক্রান্ত হওয়া ছাড়া ভঙ্গ করেছে (অর্থাৎ রাখেনি) তাহলে, সমগ্র মহাকাল যাবৎ রোযা রাখলেও সেটার ক্বাযা সম্পন্ন হতে পারে না। যদিও পরবর্তীতে রেখেও নেয়। (সহীহ বোখারী শরীফ, খণ্ড-২)

হযরত সায়্যিদুনা জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ্ রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ থেকে বর্ণিত, তাজ্দারে নুবুওয়াত সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি মাহে রমযান পেয়েছে আর সেটার রোযা রাখেনি, সেই ব্যক্তি হতভাগা। যে ব্যক্তি আপন মাতা-পিতাকে কিংবা উভয়ের একজনকে পেয়েছে কিন্তু তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করেনি, সেও হতভাগা, আর যার নিকট আমার নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করেনি, সেও হতভাগা। (মাজমা'উয্ যাওয়াইদ, খণ্ড-৩)

হাদীস শরীফে রয়েছে, একটি রোযার জন্য নয় লক্ষ বৎসর জাহান্নামে জ্বালানো হবে।

প্রকৃত অর্থে রোযাদার কে?

সরকারে মদীনা সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মন্দ কথা বলা ও তদনুযায়ী কর্মকান্ড পরিহার করবেনা, তার ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকার কোন প্রয়োজন আল্লাহ্র নেই। (সহীহ বোখারী শরীফ, খণ্ড-২)

আরো ইরশাদ করেছেন, শুধু পানাহার থেকে বিরত থাকার নাম রোযা নয়, বরং রোযা হচ্ছে, অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথা-বার্তা থেকে বিরত থাকাই। (হাকিম কৃত মুস্তাদরক, খণ্ড-১)

অন্য এক স্থানে ইরশাদ করেছেন, তোমাদের সাথে যদি কেউ ঝগড়া করে গালি দেয়, তবে তোমরা তাকে বলে দাও, আমি রোযাদার।

(আত্তারগীব ওয়াত্ তারহীব, খণ্ড-২)

হযরত সায়্যিদুনা দাতাগঞ্জে বখ্শ 'আলী হাজভীরী রহমাতুল্লাহি তা'আলা 'আলায়হ্ বলেন, রোযার বাস্তবতা হচ্ছে- 'বিরত থাকা।' আর বিরত থাকারও বহু

পূর্বশর্ত রয়েছে, যেমন, পাকস্থলীকে পানাহার থেকে রূখে রাখা।, চোখকে প্রবৃত্তির দৃষ্টি থেকে বিরত রাখা, কানকে গীবত শোনা থেকে, রসনা (জিহ্বা)কে অনর্থক কথাবার্তা (গীবত, চোগলখুরী) ও ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী কথাবার্তা বলা থেকে এবং আল্লাহ'র নির্দেশের বিরোধিতা থেকে বিরত রাখা হচ্ছে রোযা, যখন বান্দা এসব পূর্বশর্ত পূরণ করবে, তখনই সে প্রকৃত পক্ষে রোযাদার হবে ।

(কাশ্ফুল মাহজুব)

চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রোযার উপকারিতা

সাধারণ লোকের অনেকের এ ধারণা রয়েছে যে, রোযা রাখলে মানুষ দূর্বল হয়, অসুস্থ হয়ে পড়ে, অথচ এমন নয়। আল্লাহর হাবীব সল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা রোযা রাখো এবং সুস্থতা লাভ করো। অর্থাৎ রোযা রাখলে সুস্থ হয়ে যাবে। (দুররে মানসূর, খন্ড-১)। হযরত সায়্যিদুনা মাওলা মুশকিল কোশা 'আলী মুরতাদ্বা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ থেকে বর্ণিত, সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হযরত মুহাম্মদে মোস্তফা সল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলের এক নবী ('আলায়হিস সালাম)-এর দিকে ওহী প্রেরণ করলেন, আপনি আপনার সম্প্রদায়কে খবর দিন, যেন বান্দা আমার সন্তুষ্টির জন্য একদিনের রোযা রাখে, আমি তার শরীরকে সুস্থতাও দান করবো, তাকে মহা প্রতিদানও দেবো। (শু'আবুল ঈমান, খণ্ড-৩) আধুনিক বিশ্বে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরাও তাঁদের গবেষণায় এ সত্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন এবং তা মেনে নিচ্ছেন। যেমন- অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর মূর প্যালিড বলেন, "আমি ইসলামী বিষয়াদি অধ্যায়ন করছিলাম। যখন রোযা সম্পর্কে পড়লাম তখন দোলে উঠলাম। ইসলামতো সেটার অনুসারীদেরকে এক মহা ব্যবস্থাপত্র দিয়েছে। আমার মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হলো। সুতরাং আমিও মুসলমানদের মতো রোযা রাখতে শুরু করলাম। দীর্ঘকাল ধরে আমার পাকস্থলীতে ফুলা ছিলো। কিছুদিনের মধ্যে আমার কষ্ট কম অনুভূত হলো। আমি রোযা রাখতে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত এক মাসের মধ্যে আমার রোগ সমূলে নিঃশেষ হয়ে গেলো"।

একজন ইংরেজ অভিজ্ঞ ডাক্তার সেগমিন্ট ফ্রাইড রোযার উপকারীতা স্বীকার পূর্বক বলেন, রোযার দ্বারা শারিরীক, মানসিক জটিলতা, হতাশাগ্রস্থতা ও কু-প্রবৃত্তি রোগের পরিসমাপ্তি ঘটে। (খুদখুশী কা ই'লাজ)

হল্যান্ডের পাদ্রী মিষ্টার এ্যল্ফ গাল বলেন, "আমি ডায়াবেটিক্স, হৃদরোগ ও পাকস্থলীর রোগীকে নিয়মিতভাবে ত্রিশ দিন রোযা পালন করালাম। এর ফলে ডায়াবেটিক্স রোগীদের সুগার নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে, হৃদরোগীদের আশঙ্কা ও হৃদযন্ত্রের ফুলা দূরীকরণে এবং পাকস্থলীর রোগীদের সর্বাপেক্ষা বেশী উপকার

হয়েছে"। মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সিগম্যান্ড ফ্রাইড বলেন, রোযার ফলে দেহের খিচুনী, মানসিক চাপ অর্থাৎ অস্থিরতা এবং মানসিক অন্যান্য রোগগুলো নিঃশেষ হয়ে যায়। জার্মানী, ইংল্যান্ড ও আমেরিকার চিকিৎসকদের এক সমীক্ষা-টিম রমযানুল মুবারকে মুসলমানদের এক এলাকায় সার্ভে করে তারা একটা রিপোর্ট উপস্থাপন করেন, তাতে এরূপ রিপোর্ট ছিলোঃ যেহেতু মুসলমান নামায পড়ে ও রমযান শরীফে রোযার প্রতি বেশী যত্নবান হয়, সেহেতু ওযূ করার ফলে E.N.T অর্থাৎ নাক-কান ও গলার রোগগুলো তাদের কমে যায়। তাছাড়া রোযার কারণে তারা কম আহার করে। সুতরাং পাকস্থলী, কলিজা, হৃদরোগ ও শরীরের জোড়াগুলোর রোগে কম আক্রান্ত হয়। রোযার মধ্যে কোন রোগ-বালাই নেই। কিন্তু আমাদের অসতর্কতার কারণে সাহরী ও ইফ্তারীতে বেশী পরিমাণে তেল-চর্বিযুক্ত ও ভাজা খাবার মাত্রাতিরিক্ত আহার করার কারণে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই রাতের বেলায় ক্ষণে ক্ষণে আহার করতে থাকা এবং ক্ষুধা অনুভূত না হওয়ার জন্য পেটকে খাদ্য ভান্ডারে পরিণত করা উচিত নয়। যদি ক্ষুধা-পিপাসা অনুভবই না হয়, তাহলে রোযার তৃপ্তিই বা কি? রোযা পালনের উদ্দেশ্যই বা কি?

রোযায় ক্ষতিকর খাবার বাদ দেওয়ার পরামর্শ

রোযায় ইফত্বারে ভাজাপোড়া, বেশি মসলাদার এবং অনিরাপদ পরিবেশে তৈরি খাবার পরিহারের পরামর্শ দিয়েছেন খাদ্য নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা। সারাদিন রোযা শেষে ইফত্বারে বিশুদ্ধ পানীয়, মিষ্টান্ন ও তাজা খাবার গ্রহণের পরামর্শ রয়েছে তাঁদের। 'নিরাপদ খাদ্যের আলোকে রমযান মাসের রকমারি ইফত্বার' শীর্ষক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞদের এ মতামত উঠে আসে।

তাঁরা বলেন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের দায়িত্ব উৎপাদক, পরিবেশক, ভোক্তাসহ সব মহলের। পুলিশ কিংবা একক কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এটি সম্ভব নয়। অনেক সময় সঠিক ধারণার অভাবে ভালো খাবারও আমরা নষ্ট করে খাই। হোটেল ব্যবসায়ীরা শুধুমাত্র সঠিক জ্ঞানের অভাবে অস্বাস্থ্যকর খাবার পরিবেশন করে। তাই এসব বিষয়ে সবার সজাগ হওয়া প্রয়োজন। কেবলমাত্র পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার নিচে এবং ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রায় খাবার নিরাপদ থাকে জানিয়ে তারা বলেন, হোটেলের খাবারগুলো সাধারণত এই তাপমাত্রায় থাকেনা। দোকানে ইফতার সামগ্রীও থাকে ২০/২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যে, যা সম্পূর্ণ অনিরাপদ।

ইফত্বারে বেগুনি, পেঁয়াজুসহ অন্যান্য ভাজাপোড়া খাবার এড়িয়ে চলতে হবে। বেশি মসলাযুক্ত খাবার পাকস্থলীর জন্য 'ইরিটেটিং', এগুলো এড়িয়ে চলতে হবে। জাঙ্কফুড পরিত্যাগ করতে হবে। নিরাপদ খাবার কিনে বাসায় অনিরাপদ স্থানে রাখলে মান নষ্ট হতে পারে। তাই খাবার সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

ফুটপাতে বিক্রি হওয়া ইফত্বার সামগ্রী অসংখ্য মানুষের সংস্পর্শে আসার কারণে জীবাণু আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা বেড়ে যায়। এসব এড়াতে হবে। অধিক চিনিযুক্ত খাবারও পরিত্যাগ করা উচিত। ইফত্বারে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি পান করা প্রয়োজন। শরবত তৈরিতে ব্যবহৃত পানি ও বরফ বিশুদ্ধ কিনা জেনে নিতে হবে। ইফত্বারিতে ফলফলাদি থাকা উচিত। জলীয় খাবার পাকস্থলীর জন্য অধিক সহনীয় ও স্বস্তিকর। এসব বেশি গ্রহণ করা উচিত। গরমের মৌসুমের রোযায় বিশেষভাবে ফল-মুল খাওয়া প্রয়োজন।

স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী খাদ্যাভ্যাস

কাবাব, চমুচা, পেঁয়াজু, বেগুনী, শামী কাবাব, মাছ ও মুরগী ইত্যাদির ভুণাকৃত টুকরো, পুরী, তেলে ভাজা সামগ্রী, পিজ্জা, পরাটা, ডিম, আমলেট ইত্যাদি নিজের মধ্যে কি কি ধরনের জীবন বিনাশক রোগ-ব্যাধি নিয়ে আছে এটা অনেকেরই অজানা। ভাজার জন্য যখন তেল খুব গরম করা হয় তখন ডাক্তারী গবেষণা অনুযায়ী তাতে অনেক ক্ষতিকারক বস্তু সৃষ্টি হয়ে যায়। ভাজার জন্য ঢালা বস্তু থেকে যে আর্দ্রতা বের হয়, তার কারণে গরম তেল থেকে এক ধরনের শব্দ বের হয়, যা এটার রাসায়নিক অংশগুলো বিনষ্ট হওয়ার আলামত। আর এ কারণে খাদ্যের অংশ ও ভিটামিন অনেকাংশে নিঃশেষ হয়ে যায়।

ভাজাকৃত খাবার থেকে সৃষ্ট কিছু রোগ

১) শরীরের ওজন বৃদ্ধি পায় ২) শৌচকার্যে গোলমাল সৃষ্টি করে ৩) পেটের ব্যথা ৪) চর্বির তুলনায় অধিক দ্রুততার সাথে রক্তে ক্ষতিকারক কোলেস্টেরল (LDL) তৈরি করে ৫) উপকারী কোলেস্টেরল (HDL)-এ ঘাটতি আসে ৬) হজম শক্তি বিনষ্ট হয় ৭) পেট ফাঁপা ৮) বিষাক্ত বস্তু 'আইকলোলিন'-এর সৃষ্টি হয়, যা নাড়িভূড়িতে রেখার সৃষ্টি করে বরং ক্যান্সারের কারণও হতে পারে ৯) ভয়ানক বিষাক্ত বস্তু 'ফ্রিরেডিকল্স' তৈরী হয়, যা ১০) হৃদরোগ ১১) ক্যান্সার ১২) জোড়াসমূহের ব্যথা ১৩) মস্তিষ্কের রোগ ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, 'ফ্রিরেডিকল্স' নামক বিষাক্ত বস্তু সৃষ্টিকারী আরো কিছু মাধ্যম রয়েছে। তা হলো– ধুমপান করা, বাতাসের মলিনতা (যেমন- আজকাল প্রায় ঘরের কামরা বন্ধ রাখা হয়, যাতে না রোদ আসে, না সতেজ বাতাস।) গাড়ীর ধোঁয়া, এক্সরে, মাইক্রোওয়েন, টিভি, কম্পিউটার ও মোবাইল ফোনের স্ক্রীনের আলোকরশ্মি এবং আকাশ পথে ভ্রমণের তেজস্ক্রিয়তা অর্থাৎ উড়োজাহাজের রশ্মি নিক্ষেপণ ইত্যাদি। এসব বস্তু থেকেও সাধ্য অনুযায়ী নিজেকে রক্ষা করা উচিত।

আল্লাহ্ তা'আলা এ ভয়ানক বিষাক্ত বস্তু অর্থাৎ 'ফ্রিরেডিকল্স'-এর প্রতিকার সৃষ্টি করেছেন। যে সব সবজী ও ফলের রং সবুজ, হলুদ কিংবা কমলা রং অর্থাৎ লাল

মিশ্রিত হলুদ তা এ ভয়ানক বিষকে নিঃশেষ করে দেয়। অনুরূপভাবে, ফল ও সব্জীর রং যতটুকু গাঢ় হবে তাতে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের অংশের পরিমাণও অতিমাত্রায় থাকে। তা এ বিষকে প্রচন্ডভাবে প্রতিরোধ করে থাকে। এছাড়া ভাজা বস্তুর ক্ষতিসমূহ হ্রাস করতে দুটো বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন- ১) ভাজার জন্য যে কড়াই বা ফ্রাইফেন ব্যবহার করবেন, তা যেন নন স্টিক হয় এবং ২) ভাজার পর প্রতিটি ভাজাকৃত খাবার সুগন্ধহীন টিস্যু পেপারে ভালোভাবে জড়িয়ে নিন, যাতে কিছু পরিমাণ তেল তাতে চুষে যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, একবার ভাজার জন্য ব্যবহৃত তেল, পুনরায় গরম করা উচিত নয়। যদি পুনরায় তা ব্যবহার করতে চান, তবে তা ছেঁকে ঠান্ডা করে রিফ্রিজারেটরে (ফ্রিজে) রেখে দিন এর পর প্রয়োজনে ব্যবহার করবেন। অবশ্য না ছেঁকে ফ্রিজে রাখবেন না।

উত্তম ও নিরাপদ খাবার খেয়ে উত্তম স্বাস্থ্যের মাধ্যমে ইবাদত-বন্দেগীর শক্তি অর্জনের পবিত্র নিয়্যত থাকলে তাও ইবাদতে গণ্য হবে।

সুতরাং খাবারের ক্ষতিকর ব্যবহার সম্পর্কে আরো কিছু বিষয় উপস্থাপন করা হচ্ছে– ১) মিষ্টি দ্রব্যের ডিশ, মিষ্টি ও মিষ্টি পানীয় খানা খাওয়ার কমপক্ষে আধ ঘন্টা পূর্বে খাওয়া উচিত। খানার পর এসব খাওয়া ক্ষতিকর। ২) খানা খাওয়ার আধঘন্টা পূর্বে ফল (ফ্রুট) খেয়ে নেয়া উচিত, খানা খাওয়ার সাথে সাথে ফল খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। আফসোস! আজকাল মিষ্টি দ্রব্যের ডিশ ও ফল-ফ্রুট খানার পর পরিবেশন করা হয়। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হ্ বলেন, যদি (খাবার তালিকায়) ফল থাকে তবে তা প্রথমে পেশ করা উচিত। কারণ ডাক্তারী মতে তা আগে খাওয়ায় অত্যধিক উপযোগী। এটা তাড়াতাড়ি হজম হয়। সুতরাং এটাকে পাকস্থলীর নিম্নাংশে থাকা উচিত।

আর ক্বোরআনে পাক থেকেও ফল পূর্বে থাকার ব্যাপারে জানা যায়। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ . وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ .

কানযুল ঈমান শরীফের অনুবাদঃ এবং ফলমূল যা তারা পছন্দ করবে এবং পক্ষী মাংস (থাকবে), যা তারা চাইবে। (সূরা ওয়াক্বিয়া, আয়াত-২০,২১: ইহইয়াউল উলূম, খণ্ড-২)

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা রহমাতুল্লাহি তা'আলা 'আলায়হ্ উদ্ধৃত করেন, খানার পূর্বে তরমুজ খেলে পেটকে খুব ভালভাবে পরিস্কার করে দেয় এবং রোগ সমূলে বিনষ্ট করে দেয়। (জামি'সগীর, ফাতাওয়ায়ে রযভিয়্যাহ্, নতুন সংস্করণ, খণ্ড-৫)

* খিরা, পেঁপে ও তরমুজ খাওয়ার পর পানি পান করা উচিত নয়। * ফলের সাথে চিনি খাওয়া ক্ষতিকর। * ২৫০ গ্রামের ঠান্ডা পানীয় বোতলে (কোল্ড ড্রিংক) প্রায় ৭ চামচ চিনি থাকে। * খানার সাথে সাথে চা অথবা ঠান্ডা পানীয়

পান করলে হজম ব্যবস্থায় প্রভাব ফেলে। (২০-৩০ মিনিট পরে পানি পান করতে পারেন) তাতে বদহজম ও পেট ফাঁপা রোগ হতে পারে। (খানা খাওয়ার প্রায় দু'ঘন্টা পরে দু'এক গ্রাম পানি পান করলে ফলদায়ক)। খানার (ভাত খাওয়ার পর পরই পানি পান করলে কাঁশি হতে পারে। এমনিতে খানা খাওয়ার পর পানি পান করা সুন্নাত নয়। * মজ্জা বিশিষ্ট ফল (যেমন- পেঁপে, পেয়ারা, আপেল ইত্যাদি) ও রস বিশিষ্ট ফল (যেমন- মুছাম্বী, কমলালেবু ইত্যাদি) একসাথে খাওয়া উচিত নয়। * ফলের সাথে চিনি খাওয়া ক্ষতিকর। * আপেল, চীকু, আড়ু, আলূচাহ্, আমলূগ, খিরা ইত্যাদি ফল না ছিলে খাওয়া ফলদায়ক। কারণ খোসার মধ্যে উৎকৃষ্ট রগ-রেশা (ফাইবার) থাকে। হযরত সায়্যিদুনা 'আলী মুরতাদ্বা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ্ বলেন, আনারের দানা পাতলা আবরণসহ খাওয়া উচিত, যা দানার উপর জড়ানো থাকে। এটা পাকস্থলীকে শক্তিশালী করে। (তারীখুল খোলাফা)

* মুছাম্বী, কমলালেবু, ইত্যাদির মোটা খোসা উঠিয়ে নেয়ার পর অবশিষ্ট ফাতলা খাদ্যের ফাইবার, ব্লাড সুগার, ব্লাড কোলেষ্টেরল ও ব্লাড প্রেসার কমিয়ে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে ও খাদ্য থেকে বিষাক্ত উপাদান নিয়ে বের হয়ে যায়। এছাড়া ভূড়ির ক্যান্সার থেকে রক্ষা করে। * গোশ্ত ও মাছ একসাথে খাবেন না, এতে একটা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। * মাছ ও ডিম একসাথে খাবেন না। (হায়াতুল হাইওয়ান) * মাছ খেলে তার সাথে দুধ খাবেন না। * কাঁচা সবজী ও সালাদ খাওয়া উপকারী। * টাটকা সবজী খাওয়া অধিক ফলদায়ক। টাটকা সবজী ভিটামিন, লবণ ও খনিজ পদার্থ ইত্যাদির গুরুত্বপূর্ণ মৌল উপাদানসমূহে ভরপুর থাকে। কিন্তু যত বেশী সময় তা রেখে দেয়া হবে ততবেশী সেগুলোর ভিটামিন ও বর্দ্ধিত উপাদান বিনষ্ট হতে থাকবে। সুতরাং উত্তম হচ্ছে, যেদিন খাবেন সম্ভব হলে সেদিনই সবজী ক্রয় করবেন। সবজী রান্না করার সময় পানি খুব কম দেয়া উচিত, কারণ পানি সবজির ভিটামিন চুষে নেয়ার ক্ষমতা রাখে। তবে আলু, পিঁয়াজ, রসুন, আদা ইত্যাদি কিছুদিন রাখলে অসুবিধা নেই।

* সবজী, ফল ও তরকারীতে বিদ্যমান খাদ্য উপাদানের রক্ষক হচ্ছে সেগুলোর খোসা, সুতরাং ওগুলোর মধ্যে যেসব বস্তু সহজে খোসাসহ খাওয়া সম্ভব, সেটার খোসা ফেলে দেয়া ঠিক নয়। যেটার খোসা খুব শক্ত আর খাওয়া হয়না, সেটারও শুধুমাত্র পাতলাভাবে উঠিয়ে নেয়া উচিত। খোসা যতটুকু মোটা করে উঠিয়ে নেবেন, ততটুকু ভিটামিন ও শক্তিপ্রদ উপাদানও বিনষ্ট হবে।

* কদু (শরীফ), মিষ্টি আলু, বিটকপি (দেখতে শালগমের ন্যায় অতি লালিমাযুক্ত তরকারী বিশেষ), টমেটো, আলু ইত্যাদি খোসাসহ রান্না করা উচিত। এগুলোর খোসা আহার করা উপকারী।

* চনা খোসাসহ সিদ্ধ কিংবা ভাজাকৃত স্বাস্থ্যের জন্য ফলদায়ক। * আইসক্রীম ও চকলেট বেশী পরিমাণে খাওয়া পরিহার করুন। সম্ভব হলে একেবারে ত্যাগ করুন। * চকলেট ও মিষ্টি দ্রব্য বেশী পরিমাণে খাওয়াতে দাঁত খারাপ হয়ে যায়, কারণ চিনির ক্ষুদ্র অংশগুলো দাঁতে লেগে থেকে বিশেষ ধরনের জীবাণু বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে। শিশুদেরকে চকলেটের আসক্তি থেকে রক্ষা করা প্রয়োজন।

প্রিয় হাবীব সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সকালে নাস্তারূপে খেজুর খাও! এর ফলে পেটের (অপ্রয়োজনীয়) ক্রিমি মরে যায়। (জামি' সগীর)

হযরত সায়্যিদুনা আবূ হোরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু থেকে বর্ণিত, খেজুর খেলে 'কুলাজ' রোগ (এ্যাপেন্ডিক্স) Appendix (অর্থাৎ বড় অন্ত্রের ব্যথা রোগ) হয় না। (কানযুল ওম্মাল, খণ্ড-১)

* যে ব্যক্তি উপবাসের কারণে দুর্বল হয়ে গেছে, তার জন্য খেজুর অত্যন্ত উপকারী, কেননা এটার মধ্যে খাদ্যপ্রাণ (খাদ্যের উপাদান)-এ ভরপুর। তা আহার করলে তাড়াতাড়ি শক্তি ফিরে আসে। সুতরাং খেজুর দ্বারা ইফত্বার করার মধ্যে এ রহস্যও রয়েছে।

* রোযায় তাৎক্ষণিক ভাবে বরফের ঠান্ডা পানি পান করে নিলে গ্যাস সৃষ্টি হয়ে পাকস্থলী ও কলিজা ফুলে যাবার আশংকা থাকে প্রকট। খেজুর খেয়ে ঠান্ডা পানি পান করলে ক্ষতির আশংকা মুক্ত হওয়া যায়। অবশ্য, খুব বেশী ঠান্ডা পানি পান করা যেকোন সময়েই ক্ষতিকর।

* খেজুর ও খিরা, অনুরূপভাবে খেজুর ও তরমুজ একসাথে খাওয়া সুন্নাত। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভিমত হচ্ছে– এতে লিঙ্গগত ও দেহগত দুর্বলতা ও ক্ষীণতা দূর হয়ে যায়। মাখনের সাথে খেজুর খাওয়াও সুন্নাত। (ইবনে মাজাহ শরীফ)

* খিরা লবণ লাগিয়ে খাওয়াও সুন্নাত।

* একসাথে পুরানা ও তাজা খেজুর আহার করাও সুন্নাত।

ইবনে মাজাহ্ শরীফে আছে– যখন শয়তান কাউকে এমন করতে দেখে তখন এ বলে আফসোস করে, পুরানার সাথে নতুন খেজুর খেয়ে মানুষ মজবুত দেহ বিশিষ্ট হয়ে গেলো।

* খেজুর খেলে পুরানা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়ে যায়। মা 'আয়িশা সিদ্দীক্বাহ্ রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহা বর্ণনা করেন, স্বামীর ঘরে আসার পূর্বে আমি খুবই দুর্বল ছিলাম- আমার আম্মীজান আমাকে হৃষ্টপুষ্ট করার জন্য চেষ্টা করতেন, যাতে হুযূর (সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট পাঠাতে পারেন। যখন কোন কৌশল ফলপ্রসূ হলোনা তখন তিনি আমাকে খেজুর ও শশা (খিরা) একত্রিত করে খাওয়াতে শুরু করলেন, তাতে আমি (কিছুদিনের

মধ্যেই) হৃষ্টপুষ্ট হয়ে গেলাম। (সুনানে ইবনে মাজাহ্ শরীফ, খণ্ড-৪)

* রমযানুল মুবারকে সাহ্রীতে তরমুজ খেলে দিনের বেলায় তৃষ্ণার্ত হবেনা।

* যে দিন তরমুজ খাবেন সে দিন ভাত খাওয়া মোটেও উচিত নয়।

* সাহ্রীর সময় অল্প পরিমাণ তরমুজ খেলে সারাদিন গরম ও লু বাতাস থেকে মুক্তি পাবেন।

* গ্রীষ্মকালে রমযানুল মুবারকে তরমুজ খেলে অসংখ্য উপকার হয়। এটা আপনার পানি শূন্যতাও দূর করবে এবং শক্তি বৃদ্ধি করবে।

*রসূলে কারীম সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম- এর নিকট তাজা ফলের মধ্যে তরমুজ ও আঙ্গুর বেশি পছন্দনীয় ছিল। (কানযুল উম্মাল, খন্ড ৭ থেকে সংকলিত) অনেক সময় ভেজা খেজুরের সাথে (তরমুজ) খেতেন।(তিরমিযী, খন্ড ৩ থেকে সংকলিত) তরমুজ রুটি ও চিনি দিয়ে আহার করতেন।(আত্ তাহাফুস্ সা'দাতুল মুত্তাক্বীন, খন্ড ৮ থেকে সংকলিত) * তিনি কাঁচা রসুন, কাঁচা পেঁয়াজ ও গিনদনা (এক প্রকার দূর্গন্ধ যুক্ত সবজী) খেতেন না। (তারীখে বাগদাদ, খন্ড ২ থেকে সংকলিত)* রাতে হোক কিংবা দিনে তরমুজ খেয়ে পানি পান করা উচিত নয়।

* চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, ফল খাওয়ার পূর্বে পানি পান করা উপকারী, চা পান করার পূর্বে পানি পান করাও ফলদায়ক তবে ডায়াবেটিস রোগ না হওয়া সত্ত্বেও বারবার প্রস্রাব হলে তখন চা পান করার পূর্বে পানি পান করবেন না (ঘরোলে ই'লাজ) এবং খানা খাওয়ার পূর্বে ফল খাওয়া উচিত, পরে নয়।

* তরমুজ খেয়ে তৎক্ষণাৎ ঘুমালে কলেরা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। * শ্লেষ্মা রোগী, পাকস্থলীর ব্যথা, যাদের মেরুদন্ডে ব্যথা রয়েছে, প্রস্রাব বেশি হয় এবং ডায়াবেটিস রোগীদের তরমুজ খাওয়া উচিত নয়। * রমযানুল মুবারকে ইফত্বারের দু'ঘন্টা পর তরমুজ খাবেন। * সাহ্রীর সময় খাবার গ্রহনের পর একটি খেজুর চিবিয়ে ও এক চুমুক পানি মুখে নিয়ে মুখের ভিতর মিক্স করে গিলে ফেলুন। এভাবে একই পদ্ধতিতে তিনটি খেজুর খেয়ে নিন, রোযা অবস্থায় সারাদিন পিপাসা থেকে সুরক্ষিত থাকবেন ইনশা-আল্লাহ্।

* দুই চামচ চিনি (উত্তম হচ্ছে বাদামী চিনি) ও এক চামচ সাদা লবন, আধা লিটার পানিতে ঢেলে সিদ্ধ করুন। ঠান্ডা হওয়ার পর ইফত্বারের সময় ১ গ্লাস পান করুন। শরীরের পানি শূন্যতা ও শারীরিক দূর্বলতা দূর হয়ে যাবে। রোগীদের দূর্বলতা দূর করতে এ পানি খুবই উপকারী। (তবে ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্ত চাপের রোগীদের ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করবেন) * ফজরের নামাযের পর একবার সূরা কাউসার পাঠ করে হাতে ফুঁক দিয়ে চেহেরার উপর হাত বুলিয়ে নিন, রোযা অবস্থায় প্রচন্ড পিপাসা থেকে সুরক্ষিত থাকবেন ইনশা-

আল্লাহ। *আম নতুন রক্ত তৈরি করে, আম অন্ত্রকে শক্তিশালী করে, পাকস্থলী, কিডনী, মূত্রথলী ও হৃদপিন্ডে শক্তি যোগায়। * আম খাওয়া ক্যান্সার ও হার্টের রোগীদের জন্য খুবই উপকারী। * আম কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। * আম পিপাসা নিবারণ করে ।* আম কেটে খাওয়ার পরিবর্তে চুষে খাওয়া উত্তম। * আম সর্বদা ঠান্ডা করে খাওয়া উচিত; ঠান্ডা না করে খেলে শরীরে খোশপাঁচড়া ও চোখের রোগ সৃষ্টি হতে পারে। * আম সামান্য পরিমাণে খাবেন; বেশি পরিমাণে খেলে যকৃতের দূর্বলতা ও পিপাসার রোগ বৃদ্ধি পায়। যার কারণে পেট বেড়ে যায়, ঘনঘন পিপাসা অনূভুত হয়। * টক আম খেলে গলা ও দাঁতের ক্ষতি হয় এবং এর দ্বারা কফ ও রক্তে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। * ডায়াবেটিস রোগীদের ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত আম খাওয়া উচিত নয়। * আম ও অন্যান্য ফল-ফলাদি পাকানোর জন্য কার্বাইড (**Carbide**) ইত্যাদি কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়। তাই তা কিছুক্ষণ পানিতে ডুবিয়ে রেখে ভাল করে ধুয়ে ব্যবহার করুন। কার্বাইড এর সামান্য পরিমাণ ও পেটে গেলে পাকস্থলী ও অন্ত্রের রোগ ব্যতীত ক্যান্সারও হতে পারে।

পানাহারের সুন্নাত ও ইসলামী রীতি

আল্লাহ্‌র মাহবূব সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আদম সন্তান নিজের পেটের চেয়ে অধিক মন্দ, (অন্যকোন) থালা ভর্তি করেনা। মানুষের জন্য কয়েকটি গ্রাস যথেষ্ট, যা তার পিঠকে সোজা রাখে। যদি এরকম করতে না পারে, তবে এক তৃতীয়াংশ খানার জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানির জন্য আর এক তৃতীয়াংশ (যেন) নিঃশ্বাসের হয়। (সুনানে ইবনে মাজাহ্, খণ্ড-৪)

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী রহমাতুল্লাহি তা'আলা 'আলায়হ্ বলেন, খাওয়ার পূর্বে ক্ষুধা থাকা আবশ্যক। যে কেউ খানা আরম্ভ করার সময়ে ক্ষুধার্ত ছিলো এবং ক্ষুধা অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় হাত গুটিয়ে নিল, সে কখনো ডাক্তারের মুখাপেক্ষী হবেনা। (ইহইয়াউল উলূম, খণ্ড-২)

এছাড়া অধিক খাওয়াতে খাওয়ার পর বসা থেকে উঠতে কষ্ট অনুভূত হয়, ইবাদতে অলসতা আসে, পাকস্থলী খারাপ হয়ে যায় এবং অনেকের মেদ বেড়ে যায়। কোষ্ট-কাঠিন্য, পেট ফাঁপা, বহুমূত্র ও হৃদপিন্ড ইত্যাদি রোগের সম্ভবনা বৃদ্ধি করে। (খানেকা ইসলামী ত্বরীকাহ্)। হযরত 'আব্দুল্লাহ্ ইবনে 'আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তাজ্‌দারে রিসালাত সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আহারের পূর্বে ও পরে ওযূ করা অভাব-অনটন (পরমুখাপেক্ষীতা) দূরীভূত করে দেয়। আর এটা রসূলগণ (আলায়হিমুস্‌সালাম) এর অন্যতম সুন্নাত। (ত্বাবারানী)

খাওয়ার পরের ওযূ জুনূন (পাগলামী)-কে প্রতিরোধ করে। (মাজমা'উয যাওয়াইদ, খণ্ড-১৫) খাওয়ার আগে ও পরে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে নেয়া সুন্নাত। যদি আহারের জন্য মুখ না ধূয়ে থাকে, তবে একথা বলবেন না যে, সে সুন্নাত বর্জন করেছে। (বাহারে শরীয়ত, খণ্ড-১৬)

অবশ্য কুলি করে নেয়া ভাল। শাহানশাহে মদীনা সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌র নিকট একথা সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় হচ্ছে– যদি তিনি কোন মু'মিন বান্দাকে তার বিবি ও সন্তান-সন্ততিদের সাথে দস্তরখানার উপর বসে আহার করতে দেখেন। কেননা, যখন সবাই দস্তরখানার উপর একত্রিত হয়, তখন আল্লাহ্ তাদেরকে রহমাতের দৃষ্টিতে দেখেন। আর তারা সেখান থেকে পরস্পর আলাদা হবার পূর্বেই তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। (নুযহাতুল মাজালিস)

* খাবার সময় দস্তরখানা (কাপড়, চামড়া, খেজুর পাতা) বিছানো সুন্নাত। (প্লাষ্টিকেরও ব্যবহার করতে পারেন)। তাতে যেন কোন ধরণের লেখা কোন ভাষায় না থাকে। (খানেকা ইসলামী ত্বরীকাহ্)

* খানা খাওয়ার সময় বাম পা বিছিয়ে দেবেন, আর ডান পা দাঁড় করিয়ে রাখবেন। অথবা পাছা দু'টির উপর বসে যাবেন আর হাঁটু দু'টি দাঁড় করিয়ে রাখবেন। কিংবা দু'জানু হয়ে বসবেন। এ তিন ধরনের যেকোন পন্থায় বসবেন। সুন্নাত পালন হয়ে যাবে। (প্রাগুক্ত)

* খালি মাথায় খাবার খাবেন না।

* প্লাস্টিকের বাসন কিংবা পাত্রে গরম খাবার, চা, পানি ইত্যাদি রেখে খেলে চুল ঝরে যাওয়ার রোগ হয়।

* বাদাম চুল ঝরে যাওয়া রোগের জন্য প্রতিষেধক হয়ে থাকে। আর কালো জিরা পিষে মেহেদীর (পাতা বা গুড়া) সাথে মিশিয়ে লাগালে চুল ঝরা বন্ধ হয়ে যায়। তবে টিউব মেহেদির মধ্যে যেগুলো লাগালে আলাদা আবরণ সৃষ্টি হয় তা ব্যবহারে ওযূ ও গোসল আদায় হবে না।* পতিত রুটির টুকরো উঠিয়ে খেয়ে নেয়া সুন্নাত। (ইবনে মাজাহ, খণ্ড-৪ থেকে সংকলিত)

* আল্লাহ্‌র হাবীব সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দস্তরখানা থেকে খাবারের পতিত টুকরো (অংশ) তুলে নিয়ে খাবে সে প্রাচুর্য্যময় জীবন-যাপন করবে এবং তার সন্তান ও সন্তানের সন্তানেরা স্বল্প বিবেকবান (অল্প মেধা সম্পন্ন) হওয়া থেকে নিরাপদ থাকে। (কানযুল উম্মাল, খণ্ড-১৫) আর ওই টুকরোগুলো জান্নাতের হুরদের মহর হয়ে যাবে। (কীমিয়ায়ে সা'আদাত) হাদীস শরীফে রয়েছে, যে খাবারের পতিত টুকরা উঠিয়ে খেয়ে নেবে, সে প্রাচুর্যপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করবে এবং তার বংশের মধ্যে কল্যাণ থাকবে। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ্, খণ্ড-১০)

* শুরু ও শেষে লবণ বা লবণ জাতীয় কিছু খাবেন। এতে ৭০টি রোগ দূরীভূত হয়। (রদ্দুল মুখতার, খণ্ড-৯) আর এটা সুন্নাত। (হায়াতে আ'লা হযরত)
* ডান হাতে পানাহার করা সুন্নাত আর বাম হাতে খাওয়া শয়তানেরই পন্থা। (মুসলিম শরীফ থেকে সংকলিত)
* বাম হাতে কোন কিছু দেয়া-নেয়াও শয়তানের কাজ।
* তিনি (রাসূলে পাক) তিন আঙ্গুল মুবারক দিয়ে আহার করতেন। (মুসান্নাফে আবী শায়বাহ্, খণ্ড-৫ থেকে সংকলিত)
* আর কোন সময় চার আঙ্গুল মুবারক দিয়ে খেয়ে নিতেন। (জামি' সগীর)
* হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু 'আনহ্ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তিন আঙ্গুল ব্যবহার করে খানা খাও! এটা সুন্নাত এবং পাঁচ আঙ্গুল ব্যবহার করে খেওনা। এটা গ্রাম্য লোকদের পদ্ধতি। (হাকীম) তবে ভাত ইত্যাদি যা তিন আঙ্গুল দ্বারা খাওয়া সমস্যা তা চার বা পাঁচ আঙ্গুলে খেতে পারেন।
* খাওয়ার পর প্রথমে মধ্যমা এরপর শাহাদাত অতঃপর বৃদ্ধাঙ্গুল তিনবার করে চাটুন। প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম খানার পর মুবারক আঙ্গুলগুলোকে তিনবার চেটে নিতেন। (শামায়িলে তিরমিযী) ওলামায়ে কিরাম বলেন, চার বা পাঁচ আঙ্গুলে (ভাত ইত্যাদি) খেলে, তখন বৃদ্ধাঙ্গুলীর পর অনামিকা অতঃপর কনিষ্ঠ আঙ্গুল চাটা উচিত। এমনভাবে চেটে নিতেন যে, পবিত্র আঙ্গুল গুলো লাল হয়ে যেত। (সহীহ মুসলিম, খণ্ড-২) এতে হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়।
* যে বাসনে খেয়েছেন সেটা চেটে নেয়ার পর ধুয়ে পান করুন। (ধুয়ে পানি পান করা সুন্নাত নয়) একজন গোলাম মুক্ত করার সাওয়াব অর্জিত হবে। (ইহইয়াউল উলূম, খণ্ড-২; কীমিয়ায়ে সা'আদাত)
* নুযহাতুল মাজালিস-এর মধ্যে চল্লিশজন আরবী গোলাম আযাদ করার সাওয়াব লিখা হয়েছে।
*পানি পান করার সুন্নাত হল বিসমিল্লাহ্ বলে ডান হাতে বসে, তিন নিঃশ্বাসে, ছোট ছোট চুমুকে, আলোতে দেখে (এটা আদব), পান করে আলহামদুলিল্লাহ বলা।
* পানি চুষে পান করা সুন্নাত। বড় বড় ঢোকে পানি পান করলে কলিজায় রোগের সৃষ্টি হয়।(খানেকা ইসলামী ত্বরীকাহ্)
* খাওয়ার সময় বাম হাতে গ্লাস ধরে, ডান হাতের পিট বা আঙ্গুল লাগিয়ে রাখা, এটাও বাম হাতে পান করা। সুতরাং আঙ্গুল চেটে ডান হাতে পানি পান করুন।
* হাদীসে পাকে রয়েছে, (খানা শেষ করার পর) রসূলে খোদা সল্লাল্লাহু তা'আলা

'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম (উভয়) হাত ধৌত করলেন আর হাতের আর্দ্রতা দিয়ে মুখ ও হাতের কব্জি ও পবিত্র মাথা মাসেহ করে নিলেন এবং নিজের প্রিয় সাহাবীকে বললেন, ইকরাশ! যে বস্তুকে আগুন ছুঁয়েছে (যা আগুন দ্বারা রান্না করা হয়েছে) সেটা খাওয়ার পর এটা হচ্ছে ওযূ।(তিরমিযী শরীফ, খণ্ড-৩)
* চর্বিযুক্ত বা তৈলাক্ত হাত সাবান দিয়ে ধোয়ার পর এরূপ আমল করবেন।
* খানার পর দাঁত খিলাল করা সুন্নাত। (খানেকা ইসলামী ত্বরীকাহ্)
* খানার পর মিসওয়াক করা দু'টি অল্পবয়স্ক গোলাম আযাদ করার চেয়েও বেশী সাওয়াব পাওয়া যায়। (তাযকিরাতুল ওয়া'ইযীন)
হুযূর পুরনূর সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আহার করতে বসার সময় জুতো খুলে ফেলো। এতে তোমার পা গুলো আরাম পাবে। নিশ্চয়ই এটা উত্তম সুন্নাত। (দারমী) আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা রহমাতুল্লাহি তা'আলা 'আলায়হ্ বলেন, জুতো পরে আহার করা যদি এ ওযরের (অপারগতা) কারণে হয় যে, যমীনের উপর বসে; কিন্তু ফরশ নেই, তখনতো শুধু একটা পছন্দনীয় সুন্নাত বর্জন করা হলো, তার জন্য উত্তম ছিলো জুতো খুলে ফেলা, আর যদি টেবিলের উপর আহার করে আর চেয়ারের উপর জুতো পরে বসে, তবে তাতো হলো খৃষ্টানদের বিশেষ চাল-চলনের অনুসরণ মাত্র। তা থেকে পালিয়ে দূরে থাকুন। হুযূর পুরনূর সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম'র ওই ফরমানকে স্মরণ করুন, যাতে হুযূর সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মান তাশাব্বাহা বিক্বাওমিন ফাহুয়া মিনহুম অর্থাৎ- যে কেউ কোন সম্প্রদায়ের সাথে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে, সে তাদের অন্তর্ভূক্ত।
হযরত আবূ দারদা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ থেকে বর্ণিত, হুযূর পুরনূর সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা হেলান দিয়ে খানা খেওনা। (মাযমা'উয যাওয়াইদ, খণ্ড-৫)
আরো ইরশাদ করেন, আমি হেলান দিয়ে খাইনা। (কানযুল উম্মাল, খণ্ড-১৫)
হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম গাযালী রহমাতুল্লাহি তা'আলা 'আলায়হ্ বলেন, হেলান দিয়ে পানি পান করাও পাকস্থলীর জন্য ক্ষতিকারক। (ইহইয়াউল উলূম, খণ্ড-২)
খাওয়ার সময় হেলান দেয়ার চারটি অবস্থা রয়েছে–
১) একটি বাহু যমীনের দিকে করে (অর্থাৎ ডানে বা বামে ঝুকে বসা) ২) চার জানু (অর্থাৎ দু' পা দু'দিকে ফেলে) বসা। ৩) এক হাত যমীনের উপর রেখে (সেটার উপর) ভর দিয়ে বসা। ৪) দেয়াল (কিংবা চেয়ারের পেছনে) ইত্যাদিতে হেলান দিয়ে বসা। এ চারটি অবস্থা (ওযর না থাকলে) ঠিক নয়। দু'জানু অথবা দু'হাঁটু দাঁড় করিয়ে বসে খাওয়া উত্তম। চিকিৎসা বিজ্ঞানমতেও উপকারী। দাঁড়িয়ে

খানা খাওয়া ঠিক নয়। (এটা ইয়াহুদীদের স্বভাব) (মিরআত শরহে মিশকাত, খণ্ড-৬)
হযরত সায়্যিদুনা আনাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু বলেন, নবী কারীম সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে পান করতে ও দাঁড়িয়ে আহার করতে নিষেধ করেছেন। (মাজমা'উয যাওয়াইদ, খণ্ড-৬)
ইতালির এক খাদ্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের বর্ণনা, দাঁড়িয়ে খানা খাওয়ার দরুন প্লীহা ও হৃদরোগ ছাড়াও মানসিক রোগসমূহ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এমনকি অনেক সময় মানুষ এমনভাবে পাগল হয়ে যায় যে, নিজের পরিচয় পর্যন্ত ভুলে যায়।
* খানার পর কাগজ দিয়ে হাত মুছবেন না। তোয়ালে ইত্যাদি দিয়ে মুছতে পারেন। পরনের কাপড় দিয়ে হাত-মুখ মুছবেন না; এর ফলে স্মরণশক্তি দুর্বল হয়ে যায়।
* যে বাসনে খানা খেয়েছে, তাতে হাত ধোয়া অথবা হাত ধোয়ে জামা বা লুঙ্গিতে মুছে নেয়া (খানা থেকে) বারাকাতকে উঠিয়ে দেয়। (সুন্নী বেহেশতী যেওর থেকে সংকলিত)
* দুপুরের খাবারের পর একটু বিশ্রাম নিন এবং রাতের খাবারের পর (কমপক্ষে) ১৫০ কদম হাঁটুন।
* যোহরের নামাযের পূর্বে খানা খেয়ে বিশ্রাম নিলে তাকে কায়লুলা বলা হয়। এটা সুন্নাত।
* খাওয়ার সময় প্রতিটি গ্রাসের পূর্বে "ইয়া- ওয়া-জিদু" পাঠ করুন, ইনশাআল্লাহ্ ওই খাবার পেটে নূর হবে। আর তাতে রোগ দূর হবে। এবং আল্লাহ্ তা'আলা ওই বান্দার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। (খানেকা ইসলামী ত্বরীকাহ্)
* খানার সময় ভাল ভাল কথা বলা যায়। ইবাদত মনে করে নিশ্চুপে খানা খাওয়া অগ্নি পূজারীদের স্বভাব। মন্দ বা অনর্থক কথা বলা থেকে বিরত থাকা খানার সময় ছাড়াও সব সময় উত্তম। (আদাবে ত্ব'আম থেকে সংকলিত)
* খানার সময় কেউ সালাম দিলে মুখে খাবার না থাকলে জবাব দিন। অবশ্য ওই সময় জবাব না দিলেও গুনাহ্ নয়। কেউ সালাম দেওয়া ও দোষ নয়। (ফিক্হ্'র কিতাব সমূহ)
* আহমদ রিফআত আ বাদ্‌রভী তার রচিত গ্রন্থ আত্বত্বিবুন্ নবভী- তে লিখেছেন, খাওয়ার পর বাসন (প্লেট) চেটে খাওয়াতে হজম হওয়াতে সাহায্য করে এবং যৌন শক্তি উদ্ভাবন করে।
* রসূলে কারীম সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম- এর পছন্দনীয় খাদ্য ছিল গোশত।(জামি' তিরমিযী, খণ্ড ৫ থেকে সংকলিত) তিনি ইরশাদ করতেন, গোশত কানের শ্রবণ শক্তি বৃদ্ধি করে আর দুনিয়া ও আখিরাতে খাবারের সর্দার। যদি আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট চাইতাম যে, আমাকে

প্রতিদিন গোশত দান করুন তবে দান করতেন। (আত্ তাহাফুস্ সা'দাতুল মুত্তাক্বীন, খণ্ড ৮ থেকে সংকলিত)
* হযরত সায়্যিদুনা লোক্বমান (হেকীম) রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু বলেন, খাওয়ার আগে পানি পান করা শরীরের জন্য শিফা , মাঝখানে পানি পান করা ঔষুধের মত এবং শেষে পানি পান করা রোগ। আরো বলেন, সকালে কলা খাওয়া স্বর্ণের মত, দুপুরে রুপার মত এবং রাত্রে বিষের মত। * ইবনে সিনা বলেন, এক খাবার হজম হওয়ার পূর্বে আরেক খাবার খাবেন না। * আহার করার সময় কথা না বলা, আবশ্যক করে নেয়া, এটি অগ্নি পূজারীদের অভ্যাস এবং মাকরূহ। অনর্থক কথা বলা সব সময় মাকরূহ এবং (খাবার সময়) উত্তম বিষয়ে আলোচনা জায়িয।(মালফূযাতে আ'লা হযরত)* হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন 'আবদুলস্নাহ্ রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, সিরকা অতি উত্তম তরকারী। রাসূলে কারীম সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসালস্নাম সব্‌জী খুবই পছন্দ করতেন। "কানযুল 'উব্বাদ"- এ রয়েছে, এর রহস্য এ যে, যেই দস্তরখানায় সব্‌জী থাকে সেখানে ফেরেশতা তাশরীফ আনেন। তিনি আরো বলেন, রসূলে কারীম সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম কদু শরীফ(লাউ) খুবই পছন্দ করতেন। "আবূ নু'আয়ম" - এর বর্ণণায় রয়েছে যে,রসূলে কারীম সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হে লোকেরা! কদু অধিক পরিমাণে খাও, কেননা এটা মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি করে। *"আবূ নু'আয়ম" - এর বর্ণণায় রয়েছে যে, রসূলে কারীম সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যায়তূন খাও এবং এটার তেল ব্যবহার কর, কেননা, এতে ৭০ টি রোগের শেফা রয়েছে। যার মধ্যে একটি কুষ্ঠ রোগও।
* নাড়িভূঁড়ি খাওয়াকে ফক্বীহগণ মাকরূহে তাহরীমী বলেছেন। পায়ের খুর খাওয়াতে অসুবিধা নেই। (ফাতাওয়ায়ে রযাভিয়্যাহ্ , যুগ জিজ্ঞাসা) প্রিয় নবীসল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, রাতের খাবার কখনো ত্যাগ করোনা, যদিও তা একমুষ্ঠি খেজুরই হোক না কেন। কেননা রাতের খাবার বাদ দিলে, (তা) মানুষকে দূর্বল করে দেয়। (ইবনে মাজাহ্, খণ্ড-৪)

খানা খাওয়ার পূর্বে পড়ার দো'আ

بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ يَا حَىُّ يَاقَيُّوْمُ .

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হি ওয়া বিল্লা-হিল্লাযি লা-ইয়াদ্বুরুরু মা'আস্‌মিহী শায়উন ফিল আরদ্বি ওয়ালা-ফিস্‌সামা-ই ইয়া হায়্যু ইয়া-ক্বায়্যূমু।
এর পর পড়বেন- বিসমিল্লা-হি ওয়া 'আলা- বারাকাতিল্লা-হ্

অনুবাদঃ আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যাঁর নামের বারাকাতে যমীন ও আসমানের কোন বস্তুই ক্ষতি করতে পারে না। হে চিরঞ্জীব ও চির প্রতিষ্ঠিত। (আল্লাহ্'র নামে আরম্ভ এবং তাঁর কল্যাণে)। (কানযুল উম্মাল, খন্ড-১৫, দায়লামী)

ফযীলতঃ খাবারে (জাদু, ফরমালিন ইত্যাদির প্রভাব) বিষও থেকে থাকে তবুও ইনশাআল্লাহ্ কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (কানযুল উম্মাল, খন্ড-১৫)

খানা খাওয়ার পরের দো'আ

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ

উচ্চারণঃ আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী 'আত্বআ'মানা- ওয়াসাক্বা-না- ওয়া জাআ'লানা-মুসলিমীন।

অনুবাদঃ আল্লাহ্ তা'আলার শোক্‌র, যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন ও পান করালেন এবং আমাদেরকে মুসলমান বানালেন। (সুনানে আবূ দাউদ, খন্ড-৩)

ফযীলতঃ আল্লাহ্ প্রদত্ত নি'মাত অর্জনের পর শোকর আদায় করলে, আল্লাহ্‌পাক তা আরো বৃদ্ধি করে দেন।

এ দো'আয় পানাহারের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাথে মুসলমান হিসেবে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন, তার জন্যও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হচ্ছে। এ দো'আর বারাকাতে আমাদের রিযক্বের স্থায়িত্বের সাথে ঈমানেরও স্থায়িত্ব নসীব হবে ইনশা-আল্লাহ্।

খানার দা'ওয়াতে খাওয়ার পর পড়ার দো'আ

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ .

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আত্বই'ম মান্ আত্বআ'মানী ওয়াস্‌ক্বি মান সাক্বা-নী।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ্! তাঁকে খাওয়ান, যিনি আমাকে খাইয়েছেন এবং তাকে পান করান, যিনি আমাকে পান করিয়েছেন। (মুসলিম শরীফ, ২ খন্ড)

ফযীলতঃ উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও তার জন্য দো'আ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। এভাবে মেজবানের জন্য দো'আ করলে তার অন্তর খুশী হবে। আর মুসলমানের অন্তরে খুশী প্রদান করাও সাওয়াবের কাজ।

* হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু থেকে বর্ণিত, নূরনবী সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আদম সন্তানের সম্মুখে খানা রাখা হয় আর উঠিয়ে নেয়ার পূর্বেই তার ক্ষমা হয়ে যায়। এর উপায় হচ্ছে এ যে, যখন খানা রাখা হয় তখন বিসমিল্লা-হ্ বলে এবং যখন উঠিয়ে নেয়া হয় তখন আলহামদুলিল্লা-হ্ বলে। (জামি' সগীর)

রমযান শরীফে সাহ্‌রী ও ইফত্বারের ফযীলত

সাহ্‌রী খাওয়া রোযার জন্য পূর্বশর্ত নয়। সাহ্‌রী ছাড়া রোযা অবশ্যই বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু কোন অপারগতায় সাহরী খেতে না পারলে, অনেকের ধারণা রোযা হবেনা।

এটা নিছক ভুল। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে সাহরী ত্যাগ করা উচিত নয়। আর সাহরীতে প্রচুর পরিমাণে খাওয়া আবশ্যক নয় বরং খেজুর, পানি বা অন্য কোন বস্তু সাহরীর নিয়্যতে খেয়ে নিলেও তা যথেষ্ট। আর খেজুর, পানি দিয়ে মাঝে মাঝে হলেও সাহরী করা উচিত। কেননা তা দিয়ে সাহ্‌রী করা পবিত্র সুন্নাত। (আস্‌সুনানুল কোবরা, নাসাঈ, খণ্ড-২ থেকে সংক্ষেপিত)

নবী কারীম, রঊফুর রহীম সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, نِعْمَ سَحُوْرَ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ .

অর্থাৎ- খেজুর হচ্ছে মু'মিনের সর্বোত্তম সাহ্‌রী। (আবূ দাউদ শরীফ, খণ্ড-২)

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন, তিনটা জিনিষকে আল্লাহ্ পছন্দ করেনঃ ১) ইফত্বারে ত্বরা করা ২) সাহ্‌রীতে দেরী করা ৩) নামাযে দাঁড়ানোর সময় হাতের উপর হাত রাখা। (আত্‌তারগীব ওয়াত্ আরহীব, খণ্ড-২)

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান না'ঈমী রহমাতুল্লাহি তা'আলা 'আলায়হ্ তাফসীরে না'ঈমীতে বলেন, "সাহ্‌রীতে 'দেরী' দ্বারা রাতের ষষ্ঠ অংশ বুঝায়।" সূর্যাস্ত থেকে সোবহে সাদিক্ব পর্যন্ত সময়কে রাত বলে। সুতরাং আজ যদি ৫টার সময় সূর্যাস্ত হয় আর ৫ টার সময় সোবহে সাদিক্ব হয়, তাহলে ৫ টা থেকে ৫ টা পর্যন্ত এ ১২ ঘন্টা সময়কে রাত বলা হবে। এখন এ বার ঘন্টাকে ৬ দিয়ে ভাগ করলে প্রতি ভাগে দু'ঘন্টা হলো। সুতরাং আজ রাতের সাহরীর শেষ সময়ের পূর্বে দু'ঘন্টার মধ্যে পানাহার (যদি একটা খেজুর বা এক ঢোক পানিও হয়) করেন, তাহলে তা 'দেরী'-তে সাহরী হিসেবে গণ্য হবে। আর এ দেরী করাটা হলো মুস্তাহাব। কারো কারো মতে সাহরীর সময় অর্দ্ধরাত থেকে আরম্ভ হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ্ শরহে মিশকাতিল মাসাবীহ্, খণ্ড-৪)

সুতরাং এ সময়ের মধ্যে পানাহার করলে তা সাহ্‌রী হিসেবে গণ্য হবে। কেউ কেউ দেরী করতে গিয়ে সোবহে সাদিক্বের পর আযান পর্যন্ত পানাহার অব্যহত রাখে। এতে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং সাহ্‌রীর সময় নামাযের স্থায়ী ক্যালেন্ডারের হিসেবে শেষ হতেই বরং সতর্কতা স্বরূপ আরো ৫ মিনিট পূর্বে পানাহার বন্ধ করে দিন। এজন্য মসজিদে ফজরের আযানের পূর্বেই সাহ্‌রীর সময় শেষ হতেই কিংবা আরো ৫ মিনিট পূর্বে সাহ্‌রীর সময় শেষ হয়ে গেছে বলে ঘোষণা দেয়া বা শেষ সাইরেন বাজিয়ে দেয়া উচিত। প্রত্যেকের একথা জানা জরুরী যে, ফজরের আযান সোবহে সাদিক্বের পরেই দিতে হয়। এর পূর্বে দিলে আযান আদায় হলো না; পুনরায় আযান দিতে হবে, অন্যথায় এলাকার সকলে গুনাহ্‌গার হবে। (দুররে মুখতার, খণ্ড-২) এখন আযান পর্যন্ত যারা সাহরী খাবে তাদের রোযা হবে না। এভাবে নামাযের স্থায়ী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী যখন

ইফত্বারের সময় হয়ে যাবে অর্থাৎ সূর্যাস্তের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেলে, তখন ইফত্বার করতে দেরী করা উচিত নয়। আর মাগরিবের আযানের সময় ইফত্বারে ব্যস্ত না থেকে আযানের জবাব দেয়া উচিত। কেননা আযানের জবাব দেয়াতে অগনিত সাওয়াব রয়েছে। রমযান শরীফে তা আরো বৃদ্ধি পায়। যেমন- একদা মদীনার তাজদার সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হে রমণীগণ! যখন তোমরা (হযরত) বিলাল (রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু)-কে আযান ও ইক্বামাত বলতে শোন, তখন সে যেভাবে বলে, তোমরাও অনুরূপ বলো। (তাতে) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য প্রতিটি কালিমা (বাক্য)-এর বিনিময়ে এক লক্ষ (করে) নেকী লিপিবদ্ধ করবেন আর এক হাজার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং এক হাজার গুনাহ্ ক্ষমা করে দেবেন। মহিলারা এটা শুনে আরয করলেন, এটা নারীদের জন্য, পুরুষদের জন্য কি? ইরশাদ করলেন, পুরুষদের জন্য দ্বিগুণ। (অর্থাৎ দু'লক্ষ করে) (কানযুল উম্মাল, খণ্ড-৭)

নিয়মঃ যখন প্রতি বাক্যে আযান দাতা থামবেন, তখন জবাব দেবেন। আল্লা-হু আক্‌বার, আল্লা-হু আকবার (২ বার) আশহাদু আল্ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ্ (২ বার)। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লা-হ্ যখন প্রথমবার বলবেন, তখন বলবেন, সল্লাল্লা-হু 'আলায়কা ইয়া-রাসূলাল্লা-হ্। (আপনার প্রতি দুরূদ বা রহমত বর্ষিত হোক হে আল্লাহর রসূল) দ্বিতীয় বার বলবেন, কুররাতু 'আয়নী বিকা ইয়া রাসূলাল্লা-হ্ (সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম) (হে রসূল! সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম আপনি আমার চোখের প্রশান্তি) প্রতিবার বৃদ্ধাঙ্গুলীর (নখে চুম্বন করে) চোখে লাগাবেন অতঃপর বলবেন, আল্লা-হুম্মা মাত্তি'নী বিস্‌সামই' ওয়াল বাসার। (হে আল্লাহ্! আমার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে আমাকে ফায়দা দান করুন) যে ব্যক্তি এরূপ আমল করবেন, তাকে আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম নিজের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (রদ্দে মুখতার) কিন্তু খোতবার আযানে এভাবে মুক্তাদিগণ চোখে চুমু দেবেন না; এটা তখন নিষেধ। (ফাতাওয়ায়ে রযাভিয়্যাহ্, নতুন সংস্করণ খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা- ৩১৫)

হায়্যা 'আলাস্ সালা-হ্ ও হায়্যা 'আলাল ফালা-হ্ ৪ বার এর জবাবে লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ্ বলবেন। উত্তম হলো হায়্যা 'আলাস্‌সলা-হ্ ও হায়্যা 'আলাল ফালা-হ্‌ও বলবেন, তারপর এটা বলবেন। বরং এটাও বলে নিন। মা-শা-আল্লা-হু কা-না ওয়ামা-লাম ইয়াশা' লাম ইয়াকুন। (দুররে মুখতার, আলমগীরী)

ফজরের আযানে আস্‌সলা-তু খয়রুম মিনান্ নাওম ২ বার-এর জবাবে বলবেন, সদাক্বতা ওয়া বাররতা ওয়া বিল হাক্বি নাত্বাক্বত্। ইক্বামাতে ক্বদ্‌ক্বা-মাতিস্ সলা-হ্ ২ বার বলার জবাবে বলবেন, আক্বা-মাহাল্লা-হু ওয়া আ-দামাহা- মা-দা-

মাতিস্‌সামা-ওয়া-তু ওয়াল আরদ্ব। (আলমগীরী)

অতঃপর আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার ১ বার এবং লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ্ ১ বার- এর জবাবে অনুরূপই বলবেন, খোতবার আযানের জবাব ও আযানের দো'আ মুখে উচ্চারণ করে দেয়া মুক্বতাদীদের জন্য জায়িয নয়। (দুররে মুখতার, গাউসিয়া তারবিয়াতী নেসাব ও যুগ জিজ্ঞাসা)

* যে আযানের সময় কথাবার্তায় মশগুল থাকে। তার জন্য আল্লাহ্‌র পানাহ্ জীবনের মন্দ পরিসমাপ্তি (মন্দ মৃত্য) হওয়ার ভয় আছে। (ফাতাওয়ায়ে রযাভিয়্যাহ, গাউসিয়া তারবিয়াতী নেসাব)

* অন্যান্য আযানের জবাবও দেবেন। যেমন সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া ইত্যাদির আযান। (রদ্দে মুহতার)

* অপবিত্র অবস্থায়ও আযানের জবাব দেয়া যাবে। হায়য ও নিফাস ওয়ালী মহিলা, যে সহবাসে রত বা শৌচাগারে আছে এমন লোক জবাব দেবে না। (গাউসিয়া তারবিয়াতী নেসাব)

* যদি (একই সময়ে) কয়েকটি আযান শুনে, তবে প্রথমটির জবাবই দেয়া হবে আর (সম্ভব হলে) উত্তম হলো সব ক'টির জবাব দেয়া। (দুররে মুখতার)

* আযান মিনারে বা মসজিদের বাইরে দিতে হবে। মসজিদের অভ্যন্তরে যেন আযান দেয়া না হয়। (খুলাসা, আলমগীরী ও কাযীখান)

* আজকাল কিছু মসজিদের অভ্যন্তরেই আযান দেয়ার রেওয়াজ হয়ে গেছে, এটা সুন্নাতের বিপরীত আমল। মসজিদের অভ্যন্তরে আযান দেয়া, মসজিদ ও দরবারে ইলাহী'র প্রতি অশালীনতা ও অবজ্ঞা প্রদর্শনের সামিল। (ফাতাওয়ায়ে রযাভিয়্যাহ, নতুন সংস্করণ, খণ্ড-৫)

* একেবারে অপারগতায় মসজিদের মিহরাবে দেয়া যায়। (যুগ জিজ্ঞাসা)

এ ব্যাপারে সকলের সজাগ হওয়া উচিত। বিশেষ করে মসজিদ পরিচালনা কমিটি। এতে সুন্নাত জীবিত করার অগণিত সাওয়াব অর্জিত হবে। আল্লাহ্ পাক সকলকে তাওফীক্ব দিন। আ-মীন।

আযানের পর দো'আ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّآمَّةِ ط وَالصَّلٰوةِ الْقَآئِمَةِ ط اٰتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ ط وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ ط وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ ط وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ط بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ط

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা রব্বা হা-যিহিদ দা'ওয়াতিত তা-ম্মাহ্। ওয়াস্ সলা-তিল ক্বা-ইমাহ্। আ-তি সায়্যিদানা- মুহাম্মাদানিল ওয়াসী-লাতা ওয়াল ফদী-লাহ্। ওয়াদ্‌দারাজাতার রফী'আহ্। ওয়াব'আসহু মাক্বা-মাম মাহমূদা নিল্লাযী

ওয়া'আত্তাহু । ওয়ারযুক্বনা- শাফা-'আতাহূ ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাহ্ । ইন্নাকা লা-তুখলিফুল মী-'আ-দ । অতঃপর দুরূদ শরীফ পাঠ করুন।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! এ পরিপূর্ণ আহ্বান ও সুপ্রতিষ্ঠিত নামাযের তুমিই মালিক। তুমি আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম কে দানকর ওয়াসীলা, সম্মান ও সর্বোচ্চ মর্যাদা এবং তাঁকে প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত করো। যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ এবং ক্বিয়ামতের দিন আমাদেরকে তাঁর সুপারিশ নসীব করো। নিশ্চয় তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করো না।

সাহ্রীর অমূল্য উপহার

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَللّٰهُ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ الْقَائِمُ عَلٰی کُلِّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ

উচ্চারণ: লা-ইলা-হা-ইল্লাল্লা-হুল হাইয়্যুল ক্বায়্যূমুল ক্বা-ইমু 'আলা- কুল্লি নাফ্সিম্ বিমা কাসাবাত।

অনুবাদঃ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, প্রত্যেকের উপর বর্তাবে যা সে উপার্জন করেছে।

ফযীলতঃ যে ব্যক্তি এ দো'আ সাহ্রীর সময় ৭ বার পড়বে, সে আকাশের প্রতিটি তারকার পরিবর্তে হাজার নেকী পাবে, তার হাজার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং ততসংখ্যক তার মর্যাদা উন্নীত করা হবে। (আনীসুল ওয়া'ইযীন, বাহারে দো'আ, পৃষ্ঠা-৫৩)

ইফত্বারের সময় পড়ার দো'আ

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা লাকা সুমতু ওয়া 'আলা- রিযক্বিকা আফত্বারতু।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি রোযা রেখেছি, এবং তোমারই রিযক্ব দ্বারা ইফত্বার করেছি। (আবূ দাউদ, মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১৭৫)

ফযীলতঃ খেজুর, খোরমা অথবা পানি দ্বারা ইফত্বার করা সুন্নাত। খেজুর খেয়ে অথবা পানি পান করার পর এই দো'আ পড়বেন। ইফত্বারের দো'আ সাধারণতঃ ইফত্বারের পূর্বে পড়ার প্রচলন আছে, কিন্তু ইমাম আহমদ রযা (রহমাতুল্লাহি আলায়হ) তাঁর ফাতাওয়ায়ে রযাভিয়্যাহ'র ৩য় খন্ডে গবেষণালব্দ মাসআলা এটাই পেশ করেছেন যে, দো'আ (একটা খেজুর বা একটু পানি পান করে) ইফত্বারের দো'আ পড়া হবে। অবশ্যই ইফত্বারের পূর্বে খানার পূর্বের দো'আ অথবা বিস্মিল্লা-হ্ পড়ে নিন।

ইফত্বারের পর পড়ার দো'আ

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ

উচ্চারণঃ যাহাবায্যমাউ ওয়াব্ তাল্লাতিল উ'রূক্ব ওয়া সাবাতাল আজ্রু ইন্শা-আল্লাহ্। (প্রাগুক্ত)

অনুবাদঃ পিপাসা চলে গেলো, রগগুলো ভিজে দূর্বলতা কেটে গেলো এবং আল্লাহ্ চাইলে প্রতিদানও অবশ্যই মিলবে। (আবূ দাউদ)

ফযীলতঃ এ দো'আ পাঠ করলে হাদীসে পাকের উপর আমল হবে। এর পরে খানা খাওয়ার দো'আও পাঠ করে নিন।

ইফত্বারের দা'ওয়াতে পড়ার দো'আ

اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَاَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ

উচ্চারণঃ আফত্বারা 'ইনদাকুমুস্ সা-ইমূনা ওয়া আকালা ত'আমাকুমুল আব্রা-রু ওয়া সল্লাত 'আলায়কুমুল মালা-ইকাহ্।

অনুবাদঃ তোমাদের নিকট রোযাদাররা ইফত্বার করলো, নেক্কার লোকেরা তোমাদের খানা খেলো, আর ফেরেশ্তারা তোমাদের জন্য রহমতের দো'আ করলো। (আবূ দাউদ, মিশকাত, পৃষ্ঠা-৩৬৯)

ফযীলতঃ কেউ কোন উপকার করলে, কিছু পানাহার করালে তার জন্য দো'আ করা উচিত। এরপর খাবার পরের দো'আও পাঠ করে নিন।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ ইবনে 'আমর ইবনুল 'আস রদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু থেকে বর্ণিত, রহমাতুল্লিল 'আলামীন সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- اِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهٖ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ .

অর্থঃ নিশ্চয় রোযাদারের জন্য ইফত্বারের সময় এমন একটি দো'আ থাকে, যা প্রত্যাখ্যাত হয়না। (আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, খণ্ড-২)

রোযার নিয়্যত

রাতের বেলায় রমযান শরীফে রোযার নিয়্যত এভাবে করবেন- নাওয়ায়তু আন্ আসূমা গদাম্ মিন্ শাহ্রি রমাদ্বানাল মুবারকি ফরদ্বাল্লাকা ইয়া-আল্লা-হু ফাতাক্বাব্বাল মিন্নী ইন্নাকা আন্তাস্ সামী'উল 'আলীম।

অর্থঃ আমি আগামীকাল মাহে রমযানের ফরয রোযা তোমার সন্তুষ্টির জন্য পালন করার নিয়্যত করছি। হে আল্লাহ! আমার পক্ষ হতে তুমি ক্বুবূল করো। নিশ্চয় তুমি শ্রবণকারী ও প্রত্যেক বিষয়ে জ্ঞাত।

* তবে দিনের বেলায় দ্বি-প্রহরের আগ্ পর্যন্ত নিয়্যত করলে (গদান)-এর স্থলে

হা-যাল্ ইয়াওমি অর্থাৎ 'অদ্যকার দিনের রোযা' বলবে। বাকী শব্দগুলো একই রকম থাকবে। (গাউসিয়া তারবিয়াতী নেসাব)

*অন্তরে দৃঢ় সংকল্প করা একান্ত জরুরী, তবে রোযার নিয়্যতে সাহরী গ্রহণ করা নিয়্যতের স্থলাভিষিক্ত হয়। মুখে নিয়্যত করা মুস্তাহাব। (প্রাগুক্ত) অবশ্য সাহ্রী খাওয়ার সময় যদি এ ইচ্ছা থাকে যে, ভোরে রোযা রাখবে না, তবে এ সাহরী খাওয়া নিয়্যত নয়। (আল জাওহারাতুন নায়্যিরাহ, খণ্ড-১)

* যদি কেউ (সাহরী ও) নিয়্যত ছাড়া সোবহে সাদিক্ব থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত একেবারে পানাহার বর্জন করে থাকে, তার রোযা হবে না। (রদ্দুল মুহতার)

* রোযা পালনকালে রোযা ভঙ্গ করার শুধু নিয়্যত করে নিলে রোযা ভঙ্গ হয় না, যতক্ষণ না রোযা ভঙ্গকারী (পানাহার ইত্যাদি) কোন কাজ করে নেবেন।

(আল জাওহারাতুন নায়্যিরাহ, খণ্ড-১)

* রমযান শরীফের রোযা, নফল রোযা এবং নির্ধারিত মান্নত (অর্থাৎ নিজের কানে শুনতে পায় এমন আওয়াজে আল্লাহ্'র জন্য কোন নির্দিষ্ট দিনের রোযার মান্নত করলো) যেমন– আমার উপর এ বছর আল্লাহ্'র জন্য রবিউল আউয়াল শরীফ মাসের প্রত্যেক সোমবারের রোযা ওয়াজিব। তখন এটা নির্ধারিত মান্নত হলো আর এ মান্নত পুরা করা ওয়াজিব হয়ে গেলো। এ তিন ধরনের রোযার জন্য সূর্যাস্ত থেকে পরদিন শরীয়তসম্মত অর্ধ দিবস এর পূর্বে নিয়্যত করা জরুরী। (রদ্দুল মুহতার, খণ্ড-৩) মান্নতের জন্য মুখে বলা পূর্বশর্ত। এটাও পূর্বশর্ত যে, কমপক্ষে এতটুকু আওয়াজে বলবেন যেনো নিজে শুনতে পান। এতটুক আওয়াজে তো বলেছেন যে, নিজে মান্নতের শব্দাবলী শুনতে পান, কিন্তু বধিরতা কিংবা কোন ধরনের শোরগোল ইত্যাদির কারণে শুনতে পাননি, তবুও মান্নত বিশুদ্ধ হয়ে গেলো।। তা পূরণ করা ওয়াজিব। কল্পনায় মান্নতের (মনে মেনে বা নিয়্যত করলে তা পূরণ করা ওয়াজিব নয়) (রদ্দুল মুহতার)

শরীয়তসম্মত অর্ধদিবসের সংজ্ঞা

সোবহে সাদিক্ব থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়টুকু দু'ভাগ করে নিন। যেমন- আজ সোবহে সাদিক্ব হলো পাঁচটার সময় আর সূর্যাস্ত হলো ছয়টার সময়। উভয়ের মধ্যে সময় হলো তের ঘন্টা। এখন এটাকে দু'ভাগ করলে একভাগে সাড়ে ছয় ঘন্টা হয়। এখন আজকের সোবহে সাদিক্বের সময় ৫ টার সাথে সাড়ে ছয়ঘন্টা যোগ করলে ওইদিন সাড়ে এগারটার সময় শরীয়তসম্মত অর্ধ দিবস আরম্ভ হয়ে গেলো। সুতরাং এখন ওই তিন ধরনের রোযার নিয়্যত (এরপর) বিশুদ্ধ হতে পারে না। (রদ্দুল মুহতার)

* উপরোল্লিখিত তিন ধরনের রোযা ব্যতীত অবশিষ্ট রোযাগুলো, যেমন– রমযানের রোযার ক্বাযা, অনির্ধারিত মান্নত (অর্থাৎ- আল্লাহ্র জন্য রোযার মান্নাত

তো করলো কিন্তু দিন নির্ধারণ করেনি, বরং নির্ধারিত মান্নতের ন্যায় আওয়াজ করে নিয়্যত করলো, কিন্তু সময় নির্ধারণ না করে এভাবে বললো যে, আমার দায়িত্বে আল্লাহ্র জন্য একটি রোযা রইলো (বা আল্লাহ্'র জন্য আমি একটি রোযা রাখবো)। এখন বিশেষদিন, মাস নির্ধারণ না করায়, জীবনে যে কোন দিনে মান্নতের রোযার নিয়্যতে রেখে নেবেন, তা আদায় হয়ে যাবে) ও নফল রোযার ক্বাযা অর্থাৎ নফল রোযা রেখে ভঙ্গ করে ফেললে, সেটার ক্বাযা আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়)

আর নির্ধারিত মান্নতের রোযার ক্বাযা (নির্ধারিত মান্নতের রোযা কোন কারণে ভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল, এখন সেটার ক্বাযা আদায় করছেন) ও কাফ্ফারার রোযা (রমযান শরীফে ইচ্ছাকৃতভাবে যে রোযা ভঙ্গ করেছে, সেটার কাফ্ফারা, একাধারে ষাটটি রোযা) এবং তামাত্তু (অর্থাৎ- হজ্জ তিন প্রকারঃ ১) ক্বিরান ২) তামাত্তু ৩) ইফ্রাদ। হজ্জে কিরান ও তামাত্তু করার পর শোক্রিয়া স্বরূপ হজ্জের ক্বোরবানী করা ওয়াজিব; কিন্তু ইফরাদ কারীর জন্য মুস্তাহাব। যদি ক্বিরান ও তামাত্তুকারী খুব বেশী মিসকীন ও অভাবী হয়, কিন্তু ক্বিরান ও তামাত্তুর নিয়্যত করে নিয়েছে, এখন তার নিকট ক্বোরবানীর উপযোগী পশুও নেই, টাকাও নেই এবং এমন কোন সামগ্রীও নেই, যা বিক্রি করে ক্বোরবানীর ব্যবস্থা করতে পারে, এমতাবস্থায় ক্বোরবানীর পরিবর্তে দশটা রোযা রাখা ওয়াজিব হবে– তিনটা রোযা হজ্জের মাসগুলোতে, অর্থাৎ শাওয়ালের ১ম তারিখ থেকে যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ইহরাম বাঁধার পর ওই হজ্জে যখন চায়, রেখে নেবে। ধারাবাহিকভাবে রাখা জরুরী নয়। মাঝখানে বাদ দিয়েও রাখতে পারে। এতে ৭,৮ ও ৯ যিলহজ্জ রাখা ভালো। তারপর ১৩ যিলহজ্জের পর অবশিষ্ট সাতটি রোযা যখনই চায় রাখতে পারে। ঘরে ফিরে গিয়ে রাখাই উত্তম) -এর রোযার ক্ষেত্রে সোবহে সাদিক্বের আলো চমকিত হবারই সময় কিংবা রাতে নিয়্যত করা জরুরী। আর এটাও জরুরী যে, যেই রোযা রাখবে- বিশেষ করে ওই রোযারই নিয়্যত করবে। যদি ওই রোযাগুলোর নিয়্যত সোবহে সাদিক্ব থেকে আরম্ভ করে শরীয়ত সম্মত অর্ধ দিবস'র পূর্বক্ষণ পর্যন্ত সময়ে করে নেয়। তবে তা নফল রোযা হলো। আর তাও পূর্ণ করা জরুরী অর্থাৎ ভঙ্গ করবে না। ভঙ্গ করলে ক্বাযা ওয়াজিব হবে। (দুররে মুখতার) (আর নিয়্যত অশুদ্ধ হওয়ার কারণে ওই রোযাটাও পুনরায় পূরণ করতে হবে)।

* নামাযের মধ্যখানেও যদি রোযার নিয়্যত (উচ্চারণ ব্যতীত মনে মনে) করেন; তবে এ নিয়্যত বিশুদ্ধ। (রদ্দুল মুহতার)

যেমন- নামায শুরু করলেন, শেষ করার পূর্বে এরই মধ্যে রোযার নিয়্যতের সময় অতিবাহিত হয়ে যেতে পারে, তখন নামাযের অভ্যন্তরে মনে মনে নিয়্যত করা যাবে।

মোটকথা হলোঃ রমযানের রোযা, নির্ধারিত মান্নত ও যেকোন নফল রোযার জন্য

পূর্বের দিন সূর্যাস্তের পর থেকে রোযা পালনের দিন শরীয়ত সম্মত অর্ধ দিবস-এর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এসব রোযার নিয়্যত করে নেয়া আবশ্যক, অন্যথায় রোযা শুদ্ধ হবে না। আর এ তিন প্রকার ব্যতীত বাকী সকল রোযা আদায়ের জন্য সূর্যাস্তের পর থেকে সোবহে সাদিক্বের আলো চমকিত হবার সময়ের মধ্যে রোযার নিয়্যত করে নেয়া আবশ্যক। অন্যথায় এ রোযা নফল হিসেবে গণ্য হবে। এবং এ দু'অবস্থায় রোযাগুলোর ক্বাযা আদায় করা আবশ্যক।

(ফিক্হ'র কিতাব সমূহ)

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِى السَّحُوْرِ بَرَكَةً .

অর্থাৎ- হযরত সায়্যিদুনা আনাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা সাহ্রী আহার করো। কেননা, সাহ্রী গ্রহণের মধ্যে বারাকাত (কল্যাণ) রয়েছে। (সহীহ বোখারী ও মুসলিম)

ঈদুল ফিতরের চাঁদ রাতের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা 'আব্দুল্লাহ্ ইবনে 'আব্বাস রদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুমা থেকে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীস শরীফে এটাও রয়েছে যে, যখন ঈদুল ফিতরের মুবারক রাত আসে, তখন সেটাকে লায়লাতুল জায়িযাহ্ অর্থাৎ পুরস্কারের রাত বলে আহ্বান করা হয়। সুতরাং হাদীসের মুবারকার আলোকে এ রাত নেক্কার লোকদের পুরস্কার পাবার তথা ঈদী প্রাপ্ত হবার রাত। এ রাতের সম্মান ও মহত্ত্ব উপলব্ধি করে সেটার ফযীলত ও বারাকাতগুলো অর্জন করা উচিত। এ রাতটি ইবাদতের মাধ্যমে অতিবাহিত করবেন। বাজারে কেনাকাটার মধ্যে ব্যস্ত থাকা থেকে বিরত থাকবেন। নফল ই'তিকাফের নিয়্যতে সম্ভব হলে মসজিদে অবস্থান করবেন। বিশেষ করে যারা ই'তিকাফ করেছেন তারা ওই মসজিদে অবস্থান করে ইবাদত-বন্দেগী করা বুযুর্গানে দ্বীনের পছন্দনীয় আমল। আর তাঁরা অন্যান্যদেরকেও এর প্রতি উৎসাহিত করতেন। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি তা'আলা 'আলায়হ্ উদ্ধৃত করেছেন যে, হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম বিন আদহাম রহমাতুল্লাহি তা'আলা 'আলায়হ্ বলেন, বুযুর্গানে দ্বীন একথা পছন্দ করতেন যে, (ঈদুল ফিতরের) রাত (মসজিদেরই) অতিবাহিত করবেন, যাতে সেখান থেকেই তাঁদের দিন (অর্থাৎ ঈদ মুবারকের দিন) আরম্ভ হয়। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু বুযুর্গানে দ্বীনের এ আমল উদ্ধৃত করেন, তাঁরা চাঁদ রাতে নিজেদের ঘরে ফিরে আসতেন না, যে পর্যন্ত না তাঁরা লোকদের সাথে ঈদের নামায আদায় করে নিতেন। (দুররে মানসূর, খণ্ড-১)

ঈদের রাত সম্ভব হলে ইবাদতের মাধ্যমে জাগ্রত থেকে অতিবাহিত করবেন। অন্যথায় কমপক্ষে ইশা ও ফজরের নামায জামা'আত সহকারে আদায় করবেন। তাহলে হাদীসের ইরশাদ অনুসারে পূর্ণ রাতের ইবাদতের সাওয়াব পাওয়া যাবে। আর কমপক্ষে বার রাক'আত নফল নামায পড়বেন। ক্বোরআন মজীদের কিছু অংশ তিলাওয়াত করবেন। যিক্র ও দুরূদে পাক আদায় করবেন। চেষ্টা করে তাহাজ্জুদে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ আদায় করবেন।

তাজ্দারে মদীনা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দু'ঈদের রাতে (অর্থাৎ ঈদুল ফিত্র ও ঈদুল আযহা) জাগ্রত রয়ে ইবাদত করেছে, ওইদিন তার হৃদয় মরবে না, যেদিন মানুষের হৃদয় মরে যাবে। (ইবনে মাজাহ্ শরীফ, খণ্ড-২)

হযরত সায়্যিদুনা মু'আয ইবনে জাবলে রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি পাঁচটি রাত্রে জাগ্রত রয়ে ইবাদত করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। যিলহজ্ব শরীফের ৮, ৯ ও ১০ তারিখের রাত আর ৪র্থ ঈদুল ফিতরের রাত এবং ৫ম শা'বানুল মু'আয্যামের ১৫ তারিখের রাত (শবে বরাত)। (আত্তারগীব ওয়াত্ তারহীব, খণ্ড-২)

ঈদুল ফিতরের দিনের ফযীলত ও আমল

হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহ্হাব ইবনে মুনাব্বিহ্ রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু বলেন, যখনই ঈদ আসে, তখন শয়তান চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। তার অস্থিরতা দেখে সমস্ত শয়তান তার চতুপার্শ্বে জড়ো হয়ে জিজ্ঞাসা করে, ওহে আমাদের নেতা! আপনি কেন ক্রোধান্বিত ও অস্থির হয়ে পড়েছেন? সে বলে, হায় আফসোস! আল্লাহ্ তা'আলা আজকের দিনে উম্মতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম)-কে ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তাদেরকে প্রবৃত্তির কামনা ও তৃপ্তিতে মশগুল করে দাও।

(মুকাশাফাতুল কুলূব)

আফসোস! বর্তমান যুগে ঈদ উদযাপনের অবস্থা দেখে মনে হয়, শয়তান তার এ আক্রমণে যেন সফলকাম হতে যাচ্ছে। আজ মুসলমানদের অনেকেই উল্টোসিধে ডিজাইনের অদ্ভুদ ধরণের পোষাক পরছে, নাচ-গান, ফ্লিম, নাটক ও চিত্ত বিনোদনের আড্ডাস্থলগুলো সরগরম করছে, বে-পর্দা হয়ে গুনাহ্র বাজার গরম করছে, জুয়া, তাসসহ নানা খেল-তামাশায় লিপ্ত হচ্ছে। আর মন খুলে সময় ও সম্পদ উভয়কে শরীয়তের পরিপন্থী কার্যকলাপের মধ্যে বরবাদ করছে। অথচ এ মুবারক দিন সুন্নাত অনুসারে ও বুযুর্গানে দ্বীনের তরীক্বাহ্ অনুসারে অতিবাহিত করা ঈমানদারদের উচিত। কেননা, এ শরীয়ত বিরোধী কাজগুলোর কারণে হতে পারে- এ সৌভাগ্যের ঈদ আমাদের জন্য কঠিন শাস্তির হুমকী বয়ে আনবে।

সুতরাং ঈদের দিনকে নিজের জন্য যেন আমরা ইয়াউমে ওয়া'ঈদ বা কঠিন শাস্তির দিন বানিয়ে না নিই। মূলতঃ নতুন ফিরিঙ্গী ধরণের, বে-ঢং পোষাক পরে ইংলিশ ফ্যাশনের চুল কেটে, নানা সাজে সজ্জিত হয়ে বেপর্দা ঘোরাঘুরি করার নাম ঈদ নয়। সত্য কথাতো এটাই যে, ঈদ বা আনন্দ ওই সৌভাগ্যবান মুসলমানদের জন্য জন্যই, যারা সম্মানিত মাস রমযানের রোযাগুলো, নামাযসমূহ ও অন্যান্য ইবাদত সমূহে অতিবাহিত করেছেন। সুতরাং এ ঈদ তাঁদের জন্য আল্লাহ্ জাল্লাশানুহ্'র পক্ষ থেকে প্রতিদান পাওয়ার দিন। এ দিন তো আল্লাহকে আমাদের এরূপ ভয় করা চাই যে, হায়! আমরাতো এ মুবারক মাসের প্রতি যথার্থ কর্তব্য পালনই করতে পারলাম না। আল্লাহ্ তুমি দয়া করে আমাদেরকে ক্ষমা করো। এ খুশীর দিন আমাদের প্রিয় মুনিব হুযূর মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে গরীব-মিসকীনদের প্রতি খেয়াল রাখার শিক্ষাও দিয়েছেন। আর তাদেরকে এ খুশীতে শরীক করার জন্য সাদক্বাহ-এ ফিত্‌র-এর নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তারাও এ মহান দিবসের খুশী উদযাপন করতে পারেন।

* হযরত সায়্যিদুনা আনাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু থেকে বর্ণিত, হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সাদাক্বাহ্-এ ফিত্‌র আদায় করা হয় না, ততক্ষণ বান্দার রোযা যমীন ও আসমানের মাঝখানে ঝুলন্ত থাকে। (কানযুল উম্মাল, খণ্ড-৮)

*সাদাক্বাহ-এ ফিতরের পরিমাণ হচ্ছে গম বা এর আটা বা ছাতু অর্ধ সা' এবং খেজুর, মুনাক্কা, যব বা এর আটা বা ছাতু এক সা'।

(হিদায়া, দুররুল মুখতার, আলমগীরী)

*আজকাল প্রচলিত কেজির ওজন হিসেবে এক সা' সমান প্রায় চার কেজি একশত গ্রাম এবং অর্ধ সা' দু'কেজি পঞ্চাশ গ্রাম হয়ে থাকে। এগুলোর মূল্যও দেয়া যায়। (রদ্দুল মুহতার)

*সাদাক্বাহ্-এ ফিত্‌র প্রত্যেক মুসলমান আযাদ ও নিসাবের অধিকারীর (অর্থাৎ নিসাব পরিমান সম্পদের অধিকারী যার উপর যাকাত ফরয) উপর (মূল ব্যবহারিক সামগ্রী ব্যতীত যার পূর্ণ নিসাব থাকে) ওয়াজিব। এতে বিবেকবান, বালিগ এবং এক বছর অতিবাহিত হওয়া, সম্পদের মালিক হওয়া (মালিকানা নিজ হস্তে থাকা) পূর্বশর্ত নয়। (দুররুল মুখতার)

*নিসাবের অধিকারী পুরুষের উপর নিজের পক্ষ থেকে এবং নিজের ছোট ছেলে মেয়েদের পক্ষ থেকে সাদাক্বাহ্-এ ফিত্‌র ওয়াজিব। যদি শিশু নিজেই নিসাবের মালিক হয় তাহলে তার সম্পদ থেকে দেয়া যাবে। পাগল সন্তান বালিগ হলেও যদি সম্পদশালী না হয়, তাহলে তার পিতার উপর ওয়াজিব। আর যদি

সম্পদশালী হয়ে থাকে, তাহলে তার সম্পদ থেকে দেয়া যাবে।

(দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার)

*পিতা না থাকলে দাদা পিতার স্থলাভিষিক্ত হবেন। অর্থাৎ স্বীয় ইয়াতীম নাতি-নাতনীর পক্ষ থেকে পরিশোধ করা তার উপর ওয়াজিব। (প্রাগুক্ত)

নিসাবের মালিক পুরুষের উপর নিজের স্ত্রী, বিবেকবান বালিগ সন্তান, মাতা-

*পিতা, ছোট ভাই-বোন ও অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের সাদাক্বাহ্-এ ফিত্‌র ওয়াজিব নয়, যদিও বা পঙ্গু হয়ে থাকে এবং তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার উপর থাকে। (দুররুল মুখতার, বাহারে শরীয়ত, ও আলমগীরী)

*মায়ের দায়িত্বে তার ছোট শিশুদের পক্ষ থেকে সাদাক্বাহ-এ ফিত্‌র দেয়া ওয়াজিব নয়। (রদ্দুল মুহতার)

*স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া ফিত্‌রা আদায় করে দিলে, তা আদায় হবে না।

(বাহারে শরীয়ত)

*রোযা না রাখলেও নিসাবের অধিকারীর উপর সাদাক্বাহ্-এ ফিত্‌র ওয়াজিব। (রদ্দুল মুহতার)

*যদি রমযান শরীফে বা তার পূর্বেও যদি কেউ আদায় করে দেয় তবুও ফিতরা আদায় হয়ে যাবে। (আলমগীরী থেকে সংকলিত)

*যদি ঈদের দিন অতিবাহিত হয়ে যায়, তবুও ফিতরা থেকে দায়িত্বমুক্ত হয়নি; বরং সারা জীবনে যখনই পরিশোধ করে দেবে, তা আদায়ই হবে। (প্রাগুক্ত)

ঈদের অমূল্য উপহার

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ

উচ্চারণঃ সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহ্।

অনুবাদঃ আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও তাঁর প্রশংসা।

ফযীলতঃ যে ব্যক্তি ঈদের দিন (উভয় ঈদে) ৩০০ বার এ দো'আটি পাঠ করে মৃত মুসলমানদের রূহে এর সাওয়াব হাদিয়া হিসেবে পেশ করে, তবে প্রত্যেক মুসলমানের ক্বরে এক হাজার করে নূর প্রবেশ করবে। আর যখন ওই পাঠক নিজে মৃত্যুবরণ করবে, আলস্নাহ্ তা'আলা তার কবরেও এক হাজার নূর প্রবেশ করাবেন। (মুকাশাফাতুল কুলূব, পৃষ্ঠা-৩০৮)

ঈদের দিন যেসব বিষয় সুন্নাত (মুস্তাহাব)

ক্ষৌরকর্ম সম্পাদন করা, নখ কাটা, মিসওয়াক করা (এটা ওযূর জন্য নয় বরং এটা আজকের জন্য অতিরিক্ত। গোসলের পূর্বেও করা যেতে পারে), গোসল করা, ভালো কাপড় পরিধান করা, নতুন না হলেও ধৌত করা, সুগন্ধী লাগানো, আংটি পরা, তবে শুধু ছত্রিশ রত্তির কম ওজনের রূপার একটি পাথর বিশিষ্ট একটি মাত্র

আংটি পুরুষ পরতে পারবেন এর বাইরে লোহা, পিতল, অষ্টধাতু ইত্যাদি সকল প্রকার আংটি পরা পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ। (ইরশাদ-ই আ'লা হযরত থেকে সংকলিত)

ফযরের নামায মহল্লার মসজিদে আদায় করা। ঈদুল ফিতরের নামাযে যাবার পূর্বে কয়েকটা খেজুর খেয়ে নেয়া, তা তিন, পাঁচ, সাত কিংবা কমবেশী, কিন্তু তা বিজোড় সংখ্যক হওয়া চাই। খেজুর না থাকলে কোন মিষ্ট বস্তু খেয়ে নেবেন। (ঈদুল আযহার নামাযের পূর্বে কিছু খাবেন না, খেলেও গুনাহ্ হবেনা) ঈদের নামায ঈদগাহে আদায় করা, ঈদগাহে হেঁটে যাওয়া, ঈদের নামাযের জন্য এক রাস্তা দিয়ে যাবেন এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসবেন, (যদি দু'টো রাস্তা না থাকে, তবে একই রাস্তা ফিরে আসবেন)।

ঈদের নামাযের পূর্বে সাদাক্বাহ-এ ফিত্র আদায় করা, আনন্দ (শরীয়তসম্মত ভাবে) প্রকাশ করা, বেশী পরিমাণে দান-সাদক্বাহ্ করা, ঈদগাহে প্রশান্ত মনে, গম্ভীরভাবে ও দৃষ্টিনত রেখে যাওয়া, পরস্পর পরস্পরকে মুবারকবাদ দেয়া, ঈদের নামাযের পর করমর্দন (মোসাফাহা) ও আলিঙ্গন মু'আনাক্বাহ্ করা, ঈদুল ফিতরের নামাযের জন্য যাওয়ার পথে তাকবীর-আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, ওয়ালিল্লা-হিল হাম্‌দ। আস্তে আস্তে বলবেন, আর ঈদুল আযহার জন্য ঈদগায় (মসজিদে) যাবার পথে উচ্চস্বরে বলা।

যখনই আপনার দীদার হবে, তখনই আমার ঈদ হবে। আমার স্বপ্নে আমার দীদার দান করুন ও হে মাদানী মাদীনে ওয়ালে! সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম।

ঈদ কার জন্য?

হাদীসে পাকের আলোকে যারা ঈদের নামায পড়ে ফিরে যায়, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত অবস্থায় (ঈদগাহ বা ঈদের নামায থেকে) ফিরে যায়। (বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান) বাকি রইলো ওইসব লোক, যারা সেখানে যায় না। যেমন- গ্রাম্য লোকেরা এবং নারীরা প্রমুখ। তাদের জ্ঞামা এ কাজ (ঈদের নামায ও দো'আ করা) ছাড়াও হয়ে যায়। যেমন- সাধারণ মুসলমানদের ক্ষমা রোযা ও নামায দ্বারা, শিশু ও পাগলদের ক্ষমা নিরেট দয়ার কারণে হয়। এটা তাঁর দান, আমাদের প্রার্থনার উপর মওকূফ নয়।(মিরআত, খন্ড-৩) হাদীস শরীফের আলোকে বুঝা যায় যে, ঈদুল ফিতরের নামায ময়দানের দিকে বের হয়ে পড়া উত্তম। আর এ নামায বাস্তবিক পক্ষে ওই রবের নি'মাতেরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, যিনি আমাদেরকে রমযানের ইবাদতগুলো করার তাওফীক্ব দান করেছেন। ক্বোরআন কারীম বলছে-

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

কানযুল ঈমান শরীফের অনুবাদঃ এবং আল্লাহ্‌র মহিমা বর্ণনা করবে এর উপর যে,তিনি তোমাদেরকে হিদায়ত করেছেন (সূরা বাক্বারা,আয়াত-১৮৫) বে-রোযা, রোযা চোর, রোযা বর্জনকারী ও রোযা ভঙ্গকারীদের ঈদের খুশী উদ্‌যাপন করার অধিকারই নেই। কিন্তু আজকালতো ঈদের খুশী এসব লোককে বেশী উদ্‌যাপন করতে দেখা যায়। (মিরআত, খন্ড-৩)

* রমযান শরীফে ঈদের কেনাকাটা না করে সামর্থ্যবানদের উচিত যে, এর পূর্বে কেনাকাটা করে রমযান শরীফে ইবাদতে নিজেকে মশগুল রাখা এবং মালিক পক্ষ ও সরকারের উচিত ঈদের পূর্বেই চাকুরীজীবি ও কর্মচারীদের ঈদ বোনাস প্রদান করা, যাতে এ পবিত্র মাসে মার্কেটে ঘুরাফেরা থেকে সকলে বাঁচতে পারে।

ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহার নামাযের নিয়ম

এই নামায ছয় তাকবীর এর সাথে ইমামের পিছনে পড়তে হয়। আল্লাহু আকবর বলে নিয়্যত বাঁধার পর সানা পড়বে। তারপর ইমাম উচ্চস্বরে তিনবার " আল্লাহু আকবর" বলে তাকবীর বলবেন। প্রথম দু' তাকবীর বলার সাথে সাথে ইমাম ও মোক্বতাদী সকলেই হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে ছেড়ে দেবেন এবং তৃতীয় তাকবীরেও হাত কান পর্যন্ত উঠানোর পর নামাযের নিয়্যতের মত হাত বেঁধে নেবেন। ইমাম উচ্চস্বরে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা বা আয়াত পড়বেন। তারপর তাকবীর বলে রুকু'তে গিয়ে প্রথম রাক'আতের নামায শেষ করবেন। তারপর দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য একটি সূরা বা আয়াত পড়ার পর ইমাম উচ্চস্বরে তিনবার তাকবীর বলবেন এবার তাকবীর বলার সময় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে ছেড়ে দেবেন এবং চতুর্থ তাকবীর বলার সাথে সাথে রুকূ'তে যাবেন অতঃপর যথানিয়মে বাকী নামায শেষ করবেন। অতঃপর ইমাম দু'টি খুতবা পাঠ করে সকলকে নিয়ে মীলাদ শরীফ পড়ার পর মুনাজাত করবেন।(গাউসিয়া তারবিয়্যতী নেসাব)

সারা বিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ প্রসঙ্গ

যদি কোন এক শহরে বা রাষ্ট্রে রমযান বা শাওয়ালের নূতন চাঁদ দেখা যা, তবে অন্য শহর বা রাষ্ট্রে (যেখানে চাঁদ দেখা যায়নি) রোযা ও ঈদ পালন করতে হবে কি না? এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ আছে। বিশেষতঃ হানাফী মাযহাবের পূববর্তী ও পরবর্তী ওলামা-ই কেরামের মতে বিশ্বের কোন এক স্থানে চাঁদ দেখা গেলে সারা বিশ্বে একই সময় রোযা ও ঈদ পালন করবে। তবে শর্ত হল নির্দিষ্ট তারিখেই চাঁদ দেখা সংক্রান্ত সাক্ষ্য চাঁদ দেখা না যাওয়া স্থানে ক্বাযী বা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত প্রশাসনের নিকট সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে। শুধু রেডিও, টেলিভিশন, বেতারযন্ত্র অথবা যান্ত্রিক উপায়ে বিশ্বের কোন এক প্রান্তে চাঁদ দেখার খবর প্রচার করলে হানাফী মাযহাবের পূর্ববর্তী ফক্বীহগণের মতেও অন্য দেশে (যেখানে চাঁদ দেখা যায়নি) রোযা ও ঈদ পালন করা শুদ্ধ হবে না।

যেহেতু রোযা ও ঈদ পালন করা চাঁদ দেখার সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল, খবরের উপর নয়। (বাহারে শরীয়ত ইত্যাদি) তবে হানাফী মাযহাবের পরবর্তী ওলামা-ই কেরাম ও শাফে'ঈ মাযহাবের অধিকাংশ ইমামগণ সারা বিশ্বে চন্দ্র উদয়ের ভিন্নতার কারণে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সারা বিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ পালন করা যাবে না। যেহেতু নামায যেমনিভাবে সূর্যের গতি ও সময়ের উপর নির্ভরশীল, তেমনি রোযা ও ঈদের চাঁদ উদয়ের সময়সীমার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ সারা বিশ্বে সূর্য উদয়ের ভিন্নতা যে রকম গ্রহণীয়, তদ্রূপ অধিকাংশ ইমামগণের মতে চন্দ্র উদয়াস্তের ভিন্নতাও গ্রহণীয় সুতরাং হানাফী মাযহাবের পরবর্তী ওলামা-ই কেরামের মতে নিকটতম শহর বা রাষ্ট্রের (যেখানে চন্দ্র উদয়ের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়) কোন এক প্রান্তের চন্দ্র দেখা অপর দূরবর্তী প্রান্তের জন্য যথেষ্ট নয়। উল্লেখ্য যে, যে দেশ বা শহর পায়ে হেঁটে বা স্বাভাবিক নিয়মে অতিক্রম করতে কমপক্ষে এক মাসের অধিক সময় লাগে সে শহর বা দেশে রোযা বা ঈদ পালন করা অন্য শহর বা দেশের চাঁদ উদয়ের উপর নির্ভরশীল নয়। কোন কোন ইমাম বলেন- যতদূর এলাকাকে এক দেশ মনে করে সে এলাকার যে কোন স্থানে চন্দ্র উদয়ের সাক্ষী পাওয়া গেলে উক্ত সমগ্র এলাকায় রোযা ও ঈদ পালন করতে হবে। আর তা না হলে বরং ভিন্ন সময়ে চন্দ্র উদয় হলো, উভয় দেশ হানাফী পরবর্তী ওলামা-ই কেরামের মতে এক হুকুমের আওতায় আসতে পারে না। হাফেযুল হাদীস ওসমান বিন আলী যায়ল'ঈ হানাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শারহুল কানয্ কিতাবে 'মুতাআখখেরীনে আহনাফ' বা পরবর্তী হানাফীগণের মতকে অধিকতর উত্তম বলে গ্রহণ করেছেন।(সিরাজিয়া, বাদা-ই'উস্ সানা-ই')

সারা বছরের নফল রোযাসমূহের ফযীলত

মুহাররমুল হারাম ও আশূরার রোযার ফযীলতে রয়েছে, রসূলে খোদা সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মুহাররমের প্রতিদিনের রোযা এক মাসের রোযার সমান। (ত্বাবারানী ফিস্ সগীর)

আরো ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্র প্রতি আমার ধারণা রয়েছে যে, আশূরার রোযা এক বছর পূর্বের গুনাহ্কে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। (সহীহ মুসলিম)

আশূরা অর্থাৎ ১০ মুহাররমের রোযা সম্পর্কে আরো ইরশাদ করেছেন, আশূরার দিনের রোযা রাখো আর ইয়াহুদীদের বিরোধিতা করো এর পূর্বে কিংবা পরেও একদিনের রোযা রাখো। (মুসনাদে ইমাম আহমদ) অর্থাৎ ৯ ও ১০ অথবা ১০ ও ১১ মুহাররম রোযা রেখে নেয়া উত্তম। জঙ্গলের পশুরাও আশূরার রোযা (পানাহার বন্ধ) রাখে। (আহলে ইসলামকে নযর মে ইয়াযীদ)

সফরুল মুজাফ্ফার

প্রত্যেক মাসে তিনদিনের রোযা (চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫) তেমনি, যেমন গোটা যুগ (অর্থাৎ সর্বদা)'র রোযা। (সহীহ বোখারী)

রবিউল আউয়াল শরীফ

হযরত সায়্যিদুনা 'আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, হাসানাইন-এ কারীমাইন রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুমা'র নানাজান সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম 'আইয়ামে বীদ্ব (অর্থাৎ- চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ)-এর রোযা ছাড়তেন না- না সফরে, না হাদ্বরে (সফর বিহীন অবস্থায়)। (নাসাঈ শরীফ)

এছাড়া এ পবিত্র মাসের প্রতি সোমবার বরং এ মাস থেকে জযবা নিয়ে, সারা বছর প্রতি সোমবার রোযা রাখার নিয়্যত করুন। কেননা, রহমাতুল্লিল 'আলামীন সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম প্রতি সোমবার রোযা রেখে ধরা ধমে নিজের আগমনের দিন পালন করতেন। (সহীহ মুসলিম শরীফ) আপনিও এর স্মরণে এ রোযা এবং ১২ রবিউন নূর (আউয়াল) শরীফে রোযা রাখুন।

রবিউস্সানী

রযমানের রোযাগুলো এবং প্রতি মাসে (১৩, ১৪ ও ১৫) তিনদিনের রোযা বুকের সমস্যা দূর করে দেয়। (মুসনাদে ইমাম আহমাদ)

জমাদিউল আউয়াল

যার পক্ষে সম্ভব হয় প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোযা পালন করবে। কারণ প্রতিটি রোযা দশটি গুনাহ্ নিশ্চিহ্ন করে দেয়। আর গুনাহ থেকে তেমনিভাবে পবিত্র করে দেয়, যেমন পানি কাপড়কে। (ত্বাবরানী ফিল মু'জামিল কবীর)

জমাদিউস্ সানী

এ মাসে ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ রোযা পালনের চেষ্টা করবেন। মাসের ২০ তারিখের পর থেকে অবশিষ্ট দিনগুলো নফল রোযা রেখে রাতে ২০ রাক্আত করে নফল নামায আদায় করা সাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আলায়হিম'র আমলের অন্তর্ভুক্ত। নামাযের পর ১০০ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করে মুনাজাত করবেন। (মাসিক তরজুমান-এ আহলে সুন্নাত, জমাদিউল আউয়াল, ১৪৩৮ হিজরী)

রজবুল মুরাজ্জাব

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জান্নাতে একটা নহর আছে, যাকে 'রজব' বলে, সেটার পানি দুধের চেয়ে অধিক সাদা আর মধুর চেয়েও অধিক মিষ্ট। যে ব্যক্তি রজব মাসে

একটি রোযা রাখবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ওই নহর থেকে পানি পান করাবেন। (শু'আবুল ঈমান)

আরো ইরশাদ করেছেন, রজবের প্রথম দিনের রোযা তিন বৎসরের (গুনাহ্'র) কাফ্ফারা, আর দ্বিতীয় দিনের রোযা দু'বৎসরের এবং তৃতীয় দিনের রোযা এক বৎসরের কাফ্ফারা। অতঃপর প্রতিটি দিনের রোযা এক মাসের কাফ্ফারা। (জামি' সগীর)

বিশিষ্ট তাবিঈ' হযরত সায়্যিদুনা আবূ ক্বিলাবাহ্ রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ বলেন, রজবের রোযাদারদের জন্য জান্নাতে একটি মহল আছে। (শু'আবুল ঈমান)

হযরত সায়্যিদুনা আবূ হোরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ বলেন, যে রজবের ২৭ তারিখের রোযা রাখবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য ষাট মাস (৫ বৎসর) রোযার সাওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন। আর এটা ওই দিন, যাতে (হযরত) জিব্রাইল 'আলায়হিস্সালাম (হযরত) মুহাম্মদে আরবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়ই ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম'র জন্য পয়গাম্বরীর ঘোষণা নিয়ে নাযিল হয়েছেন। (তানযীহুশ্ শারী'আহ্)

হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্'র মাহ্বূব সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়ই ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, রজবে একটি দিন ও একটি রাত রয়েছে, যে ব্যক্তি ওই দিনের রোযা রাখবে, আর ওই রাতে কিয়াম (ইবাদত) করবে, তা ১০০ বৎসরের রোযা ও শত বছর যাবত রাত জাগ্রত রয়ে ইবাদত করার সমান হবে। তা হচ্ছে– ২৭শে রজব। এ তারিখে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লামকে নবী করে প্রেরণ করেছেন। (শু'আবুল ঈমান)

শা'বানুল মু'আয্যাম

শম্'ই বযমে হিদায়াত সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, রমযানের পর সর্বাপেক্ষা উত্তম হচ্ছে, শা'বানের রোযা, রমযানের সম্মানের জন্য। (শু'আবুল ঈমান)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা সিদ্দীক্বাহ্ রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহা বলেন, হুযূর পুরনূর সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম-কে আমি শা'বান অপেক্ষা বেশী অন্য কোন মাসে রোযা রাখতে দেখিনি। হুযূর মাত্র কয়েকটা দিন ছাড়া পুরো মাসেই রোযা রাখতেন। (তিরমিযী শরীফ)

তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্'র রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়ই ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম-এর পছন্দনীয় মাস শা'বানুল মু'আয্যাম ছিলো। সুতরাং তিনি তাতে রোযা রাখতে রাখতে তা রমযানের সাথে সংযুক্ত করে দিতেন। (আবূ দাউদ শরীফ)

অতএব সম্ভব হলে প্রতি বৎসর অথবা জীবনে কমপক্ষে একবার প্রায় সম্পূর্ণ শা'বানুল মু'আয্যামে রোযা পালন করে এ সুন্নাতের উপর আমল করে নেয়া উচিত।

হযরত সায়্যিদুনা মাওলা মুশাকিল কোশা 'আলী মুরতাদ্বা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা

'আনহ্ থেকে বর্ণিত হাদীসে পাকে এটাও রয়েছে যে, অসহায়দের সহায় হাওযে কাওসারের মালিক সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন শা'বানের ১৫তম রাতের আগমন ঘটে তখন তাতে ক্বিয়াম (ইবাদত) করো আর দিনে রোযা রাখো। (সুনানে ইবনে মাজাহ্)

শাওয়ালুল মুকার্‌রম

হযরত সায়্যিদুনা 'আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়ই ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখলো, তারপর ছয়দিন শাওয়ালে রাখলো, তবে সে গুনাহ থেকে এমনিভাবে বের হয়ে গেলো, যেনো সে আজই মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হলো। (মাজমা'উয যাওয়াইদ, খণ্ড-৩)

আরো ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখলো, তারপর আরো ছয়টি রোযা শাওয়াল মাসে রাখলো, সে যেনো সারা যুগের (সারা জীবনই) রোযা রাখলো। (সহীহ মুসলিম, খণ্ড-১)

এ রোযাগুলো রাখার ব্যাপারে রয়েছে, ঈদুল ফিতরের দিনটি বাদ দিয়ে সারা মাসে যখনই ইচ্ছা বিরতি দিয়ে কিংবা এক সাথেও রাখা যায়। (দুররে মুখতার ইত্যাদি)

যিল্ক্বা'দুল হারাম

যিলক্বদ মাসে যে কেউ যে কোন দিনে একটি রোযা রাখবে, আল্লাহ্ পাক তাকে উমরার সাওয়াব দান করবেন। এ মাসের সোমবারে কেউ রোযা রাখলে সে অগণিত ইবাদতের সাওয়াব পাবে। (মাসিক তরজুমান-এ আহলে সুন্নাত, যিলক্বদ, ১৪৩৭হিজরী)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদা হাফসা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহা থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়ই ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম চারটা জিনিষ ছাড়তেন না, আশুরা, যিলহজ্ব মাসের প্রথম ১০ দিন, প্রতি মাসের ততদিনের রোযা এবং ফজরের (ফরয) পূর্বে দু'রাক্'আত (অর্থাৎ দু'রাক্'আত সুন্নাত নামায)। (নাসাঈ শরীফ)

সুতরাং এ মাসেও ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ রোযা রেখে নেয়া উচিত।

বর্ণিত রয়েছে, যখন মাসে তিনটি রোযা রাখবে, তখন ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখেরই রাখবে। (নাসাঈ শরীফ)

যিল্হাজ্জাতুল হারাম

হাদীসে পাকে আছে, আল্লাহ্র মহান দরবারে যিল্হজ্জ মাসের প্রথম ১০দিন অপেক্ষা বেশী কোন দিনে (রমযান শরীফ ব্যতীত) তাঁর ইবাদত সম্পাদিত হওয়া পছন্দনীয় নয়। সেগুলোর মধ্যে প্রতিদিনের রোযা এক বছরের রোযা এবং প্রতি রাতে জাগ্রত রয়ে, ইবাদত করা শবে ক্বদরের সমান। (তিরমিযী শরীফ, খণ্ড-২)

আরো ইরশাদ করেন, আল্লাহ্র প্রতি আমার ধারণা হচ্ছে– আরাফার রোযা

(যিলহজ্জের ৯ তারিখ) এক বছর পূর্বের এবং এক বছর পরের গুনাহ্ ক্ষমা করিয়ে দেয়। (সহীহ মুসলিম শরীফ)

তিনি এ আরাফার রোযাকে হাজার হাজার রোযার সমতুল্য বলেছেন। অবশ্য হাজীদের জন্য, যারা আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করছেন, তাদের জন্য উক্ত রোজা মাকরূহ (যাতে তারা হজ্জের আহকাম পালনে দুর্বল হয়ে না পড়ে)।

(বায়হাক্বী শরীফ)

সপ্তাহের বিভিন্ন দিনের রোযার ফযীলত

পবিত্র সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা সুন্নাত। হযরত সায়্যিদুনা আবূ হোরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু থেকে বর্ণিত, উভয় জগতের শাহানশাহ নবী কারীম সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমলগুলো পেশ করা হয়। সুতরাং আমার পছন্দ হচ্ছে– আমার আমলগুলো তখনই পেশ করা হোক, যখন আমি রোযাদার অবস্থায় থাকি। (তিরমিযী শরীফ, খণ্ড-২)

এছাড়া অন্যত্র সোমবারে রোযা রাখার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে ইরশাদ করলেন, এদিনে আমার বেলাদত (শুভাগমন) হয়েছে, এদিনে আমার প্রতি (সর্বপ্রথম) ওহী নাযিল হয়েছে। (সহীহ মুসলিম শরীফ, খণ্ড-১)

বুধবার ও বৃহস্পতিবার রোযার ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, হযরত আমিনার বাগানের সুবাসিত ফুল, আল্লাহ্‌র প্রিয় রসূল সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি বুধ ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখে, তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়। (আবূ ইয়া'লা, খণ্ড-৫)

আরো ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রমযান, শাওয়াল, বুধ ও বৃহস্পতিবারের রোযা রাখে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আস্‌সুনানুল কুবরা, খণ্ড-২)

বুধ, বৃহস্পতি ও জুমু'আহ বারের রোযা

হযরত সায়্যিদুনা 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলে যীশান সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি বুধ, বৃহস্পতি ও জুমু'আহ্‌বার রোযা পালন করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে এমন একটি ঘর তৈরী করবেন, যার বাইরের অংশ ভিতর থেকে দেখা যাবে আর ভিতরের অংশ দেখা যাবে বাইরে থেকে।

(আল মত্‌তাজারুর রবিহ্)

হযরত সায়্যিদুনা আনাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ তার জন্য (এ তিন দিন রোযা পালনকারী) মণি-মুক্তা, পদ্মরাগ ও পান্না দ্বারা মহল তৈরী করবেন।

আর তার জন্য দোযখ থেকে মুক্তি লিপিবদ্ধ করে দেয়া হবে। (শু'আবুল ঈমান)

জুমু'আহ'র দিনের রোযা

সুলতানে কাওনাইন সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আহ্'র দিন রোযা রেখেছে, আল্লাহ্ তাকে আখিরাতের দশ দিনের সমান সাওয়াব দান করবেন। আর সেগুলোর সংখ্যা দুনিয়ার দিনগুলোর মতো নয়। (শু'আবুল ঈমান)

আখিরাতের একদিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান। অর্থাৎ জুমু'আহ্'র দিনের রোযা পালনকারী দশ হাজার বছরের রোযার সাওয়াব পায়। কিন্তু বিশেষভাবে জুমু'আহ'র একটি মাত্র রোযা কিংবা শুধু শনিবারের রোযা রাখা মাকরূহে তানযীহী। আগে বা পরেও একটা রোযা রাখতে হয়।

(বোখারী শরীফ থেকে সংকলিত)

অবশ্য যদি কোন বিশেষ তারিখে জুমু'আহ্ কিংবা শনিবার এসে যায়, তাহলে মাকরূহ নয়। যেমন ১৫ শা'বান শবে বরাত ইত্যাদি। (মুসলিম শরীফ থেকে সংকলিত)

শনি ও রবিবারের রোযা

হযরত সায়্যিদা উম্মে সালামাহ্ রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহা থেকে বর্ণিত, রসূলে মু'আয্‌যাম সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম শনি ও রবিবার রোযা রাখতেন। আর ইরশাদ করতেন, এ দু'টি দিন মুশরিকদের ঈদের দিন। আর আমি চাচ্ছি তাদের বিরোধীতা করতে। (ইবনে খুযাইমাহ্)

হাদীসে পাকে রয়েছে, শনিবারের রোযা ফরয ব্যতীত রেখোনা।

আর এখানে নিষেধ মানে কারো শনিবারের রোযাকে নির্দিষ্ট করে নেয়াই নিষিদ্ধ। কারণ ইয়াহুদীরা ওই দিনের সম্মান দেখায়। (তিরমিযী শরীফ)

পূর্ববর্তী মুসলমানগণ নফল রোযাকে খুব ভালবাসতেন। একসময় বসরা শহরের পুরো একটা মহল্লার প্রতিটি মুসলমান নফল রোযা রাখতেন। নফল রোযা রেখে তা গোপন রাখা, তা আরো বেশী সাওয়াবের কাজ।

হযরত সায়্যিদুনা দাউদ তাঈ রহমাতুল্লাহি তা'আলা 'আলায়হ্ লাগাতার ৪০ বছর যাবত রোযা পালন করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর নিষ্ঠার অবস্থা এ ছিলো যে, সে কথা নিজের পরিবার-পরিজনকেও জানতে দেননি। কাজে যাবার সময় দুপুরের খাবার সাথে নিয়ে যেতেন, আর পথে কাউকে দিয়ে দিতেন। মাগরিবের পর ঘরে এসে খানা খেয়ে নিতেন। (মা'দিনে আখলাক্ব, খণ্ড-১)

* হযরত সায়্যিদুনা ঈসা 'আলায়হিস্‌সালাম স্বীয় সাহায্যকারীদেরকে বলতেন, যখন তোমরা রোযা রাখো, তখন মাথায় ও দাঁড়িতে তৈল ব্যবহার করো। আর নিজেকে এরূপ দেখাবে যাতে রোযা রাখার বিষয়টি কেউ টের না পায়।(তাম্বীহুল মুগতাররীন) হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম বিন আদহাম রহমাতুল্লাহি তা'আলা

'আলায়হ্ বলেন, কাউকে তার নফল রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করোনা যে, তুমি কি রোযাদার, নাকি নয় ? কেননা যদি সে বলে, আমি রোযাদার। তাহলে তার অন্তর খুশী হবে এবং খেয়াল আসবে যে, আমার ইবাদত সম্পর্কে তার(প্রশ্নকারীর) ধারণা আছে। যদি বলে, আমি রোযাবস্থায় নই, তাহলে সে এভাবে চিন্তিত এবং লজ্জিত হয়ে পড়বে যে, আমি রোযা রাখিনি। (তাই) ঐ ব্যক্তি আমার ব্যাপারে যে ভাল ধারণা রাখতো তা দূর হলো। এ জাতীয় খুশী ও চিন্তা দু'টোই(রিয়া) লৌকিকতার শামিল। আর এক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি অপমানিত ও অপদস্থ হয়। শুধুমাত্র তোমার জানতে চাওয়ার কারণে সে (রিয়া) লোক দেখানোর বিপদে পতিত হলো।(তাম্বীহুল মুগতারীন) * হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আ'যম আবূ হানীফা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ বলেন, প্রতি মাসে কিছুদিন নির্দিষ্ট করে তাতে রোযা রাখো; যাতে অন্যান্য মানুষ তাতে তোমার অনুসরণ করে এবং নিজের জন্য এতটুকু ইবাদতে সন্তুষ্ট হয়ো না, যতটুকুতে সাধারণ মানুষ সন্তুষ্ট থাকে। (ওয়াসায়া ইমামে আ'যম রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্)

নফল রোযা রাখার ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবূ হোরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ থেকে বর্ণিত, হুযূর কারীম সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, যে আমার কোন ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। আর আমার বান্দা যে বিষয়গুলোর মাধ্যমে আমার নৈকট্য কামনা করে তন্মধ্যে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় হলো, ফরয কাজসমূহ। অতঃপর নফল ইবাদতের মাধ্যমে (বান্দা) আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। এমনকি আমি তাকে আমার বন্ধু হিসেবে ক্বূবূল করে নিই। যদি সে আমার নিকট কিছু চাই, তবে অবশ্যই (তা) তাকে প্রদান করবো। যদি আশ্রয় চাই, তবে অবশ্যই তাকে আশ্রয় প্রদান করবো। (বোখারী শরীফ)

ফরয রোযা ব্যতীত নফল রোযারও অভ্যাস করা উচিত। এতে উভয় জগতের অগণিত উপকারীতা রয়েছে। এজন্য কিছু নফল রোযা সুন্নাত। বুযুর্গানে দ্বীন রহিমাহুমুল্লাহ্ অন্যান্য ইবাদতের সাথে নফল রোযা রাখাকে তঁদের অভ্যাসে পরিণত করেছেন, যাতে নাফ্স দুর্বল হয়ে পড়ে, রূহানী শক্তি বৃদ্ধি পায়, আর এর মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির পথ সুগম হয় এবং আত্মিক উন্নতি হয়। আর সমস্ত কিছুর মূলে রয়েছে, তা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা। আর মহান রব্বুল 'আলামীন জাল্লাশানুহ্ যখন সন্তুষ্ট হবেন, তখন বান্দাকে নফল ইবাদত ও নফল রোযার বিনিময়ে অগণিত নি'মাত দান করবেন।

যেমন- হযরত সায়্যিদুনা ক্বায়স ইবনে যায়দ জুহানী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ্ থেকে বর্ণিত, শাফি'উল মুযনিবীন সল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি একটি নফল রোযা রাখলো, মহামহিম আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে একটা গাছ লাগাবেন, যার ফল আনার অপেক্ষা ছোট এবং আপেল অপেক্ষা বড় হবে। সেটার মিষ্টতা মধুর মতো, আর স্বাদ হবে খাঁটি মধুর মতো, তৃপ্তিদায়ক। আল্লাহ্ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন রোযাদারকে ওই গাছের ফল খাওয়াবেন। (ত্বাবরানী কবীর)

আরো ইরশাদ করেছেন- যদি কেউ একদিন নফল রোযা রাখে, আর পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণ তাকে দেয়া হয়, তবুও এর সাওয়াব পূর্ণ হবেনা। তার সাওয়াব তো ক্বিয়ামতের দিন পাওয়া যাবে। (আবূ ইয়া'লা)

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সাওয়াবের আশা রেখে একটা নফল রোযা রাখলো, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দোযখ থেকে ৪০ বছরের দূরত্বে রাখবেন। (কানযুল উম্মাল)

নফল রোযার মাসাইল

* নফল রোযা বিনা ওযরে ভেঙ্গে ফেলা না-জায়িয। মেহমানের সাথে যদি না খায় তবে তার খারাপ লাগবে, অনুরূপভাবে মেহমান না খেলে মেজবান মনে কষ্ট পাবেন। সুতরাং নফল (রোযা) ভঙ্গ করার জন্য এটা একটা ওযর, এ শর্তে যে, তার পূর্ণ ভরসা আছে যে, সে তা পূনরায় রেখে নেবে। আর (তা) 'বৃহত্তর মধ্যহ্ন' (অর্থাৎ- দ্বি-প্রহর)-এর পূর্বে ভঙ্গ করবে, তার পরে না। (আলমগীরী. খণ্ড-১)

* নফল রোযা সূর্য (স্থির থেকে) পশ্চিম দিকে হেলার পরও মাতা-পিতা নারাজ হলে ভঙ্গ করতে পারে। এমতাবস্থায় আসরের পূর্ব পর্যন্ত ভাঙ্গতে পারে, আসরের (সময় শুরু হওয়ার) পরে পারবে না। (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার, খণ্ড-৩)

* মাতা-পিতা যদি পুত্রকে নফল রোযা রাখতে বারণ করে এ কারণে যে, তার রোগের আশঙ্কা থাকে, তবে মাতা-পিতার কথা মানবে। (দুররুল মুখতার, খণ্ড-৩৪)

* নফল রোযার জন্য কন্যা পিতা থেকে, মা পুত্র থেকে এবং বোন ভাই থেকে অনুমতি নেয়ার দরকার নেই। (রদ্দুল মুহতার, খণ্ড-৩)

* নারী তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল, মান্নত ও শপথের কাফ্ফারার রোযা রাখবে না। রেখে নিলে স্বামী (প্রয়োজনে) ভাঙ্গিয়ে দিতে পারে। কিন্তু ভাঙ্গলে ক্বাযা ওয়াজিব হবে। আর সেটার ক্বাযা করার সময়ও স্বামীর অনুমতির দরকার হবে। আর নফল রোযা রাখলে স্বামীর কোন ক্ষতি না হলে, যেমন- সে সফরে গেলে (বিদেশে থাকলে), কিংবা অসুস্থ থাকলে, অথবা ইহরাম অবস্থায় থাকলে, (যখন স্বামীর প্রয়োজন না হয়, কিংবা মিলন নিষিদ্ধ) এসব অবস্থায় অনুমতি ছাড়াও ক্বাযা রাখতে পারে, এমনকি সে নিষেধ করলেও স্ত্রী রেখে দিতে পারে। অবশ্য ওই দিনগুলোতে নফল রোযা স্বামীর অনুমতি ছাড়া রাখতে পারে না। (দুররুল মুখতার, খণ্ড-৩)

* রমযান শরীফ ও রমযান শরীফের ক্বাযার জন্য স্বামীর অনুমতির কোন

প্রয়োজন নেই, বরং সে নিষেধ করলেও রাখবে। (দুররুল মুখতার, খণ্ড-৩)

* নফল রোযা ইচ্ছাকৃতভাবে ভাঙ্গেননি বরং অনিচ্ছাকৃতভাবে ভেঙ্গে গেছে। যেমন- রোযা পালনকালে নারীর হায়য এসে গেলো, তবুও ক্বাযা করা ওয়াজিব। (দুররুল মুখতার, খণ্ড-৩)

* আপনি যদি কারো কর্মচারী হোন, কিংবা তার নিকট মজদুর হিসেবে কাজ করছেন, তাহলে তার অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখতে পারেন না। কেননা, রোযার কারণে কাজে আলস্য আসবে। অবশ্য রোযা রাখা সত্ত্বেও যদি আপনি নিয়ম-মাফিক কাজ করতে পারেন, তার কাজে কোনরূপ ত্রুটি না হয়, কাজ পূর্ণ মাত্রায় হয়ে যায়, তাহলে নফল রোযার জন্য (তার) অনুমতির দরকার নেই।

(দুররুল মুখতার, খণ্ড-৩)

* নফল রোযা ইচ্ছাকৃতভাবে আরম্ভ করার পর পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। ভেঙ্গে ফেললে ক্বাযা ওয়াজিব হবে। (দুররুল মুখতার, খণ্ড-৩)

* যদি আপনি এ ধারণা করে রোযা রাখলেন যে, আপনার দায়িত্বে কোন রোযা রয়ে গেছে, কিন্তু রোযা আরম্ভ করার পর জানতে পারলেন যে, আপনার উপর কোন প্রকারের কোন রোযা নেই। এখন যদি তাৎক্ষণিকভঅবে ভেঙ্গে ফেলেন, (কিছু খেয়ে নেয়া জরুরী, কিংবা এমন কাজ করল যাতে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়, অন্যথায় নিয়্যত করলে রোযা ভঙ্গ হয় না। (আল-জাওহারাতুন্ নায়্যিরাহ, খণ্ড-১)

* তবে কোন কিছুই নেই। আর যদি একথা জানার পর তাৎক্ষণিকভাবে ভঙ্গ না করেন, তবে এখন (কিছুক্ষণ পর) ভাঙ্গতে পারবেন না। ভাঙ্গলে ক্বাযা ওয়াজিব হবে। (দুররুল মুখতার, খণ্ড-৩)

* ভুলবশতঃ আহার করেছে, পান করেছে কিংবা স্ত্রী সহবাস করেছে, রোযা ভঙ্গ হয়নি, চাই ওই রোযা ফরয হোক (ক্বাযা, কাফ্ফারা, মান্নত) কিংবা নফল। (দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, খণ্ড-৩)

* গোটা বছর রোযা রাখা মাকরূহে তানযীহী। (দুররে মুখতার, খণ্ড-৩)

* ঈদুল ফিতরের একদিন কিংবা ঈদুল আযহার চারদিন, অর্থাৎ ১০, ১১, ১২ ও ১৩ যিলহাজ্জ থেকে কোন একটি দিনের নফল রোযা রাখলেন, তাহলে (যেহেতু এ পাঁচদিন রোযা রাখা হারাম সেহেতু) এ রোযাটি পূর্ণ করা ওয়াজিব নয়। তা ভঙ্গ করলে ক্বাযাও ওয়াজিব হয় না, বরং সেটা ভেঙ্গে ফেলাই ওয়াজিব। যদি এ দিনগুলোতে রোযা রাখার মান্নত মানেন, তাহলে মান্নত পূরণ করা ওয়াজিব। কিন্তু ওই দিনগুলোতে নয়, বরং অন্যান্য দিনে (রেখে নেয়া ওয়াজিব)।

(দুররুল মুখতার, খণ্ড-৩)

Sunni-Encyclopedia.
blogspot.com
PDF by (Masum Billah
Sunny)

সংগ্রহ করুন এবং পড়ুন

কেন্দ্রীয়
দা'ওয়াতে খায়র মাহ্‌ফিল

প্রতি বৃহস্পতিবার বা'দে মাগরিব
আলমগীর খানক্বাহ্ শরীফ, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

দা'ওয়াতে খায়র

কেন্দ্রীয় দপ্তর ঃ আলমগীর খানক্বাহ্ শরীফ, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

01831177711, 01724888884

dawatekhairbd@gmail.com

www.anjumantrust.org